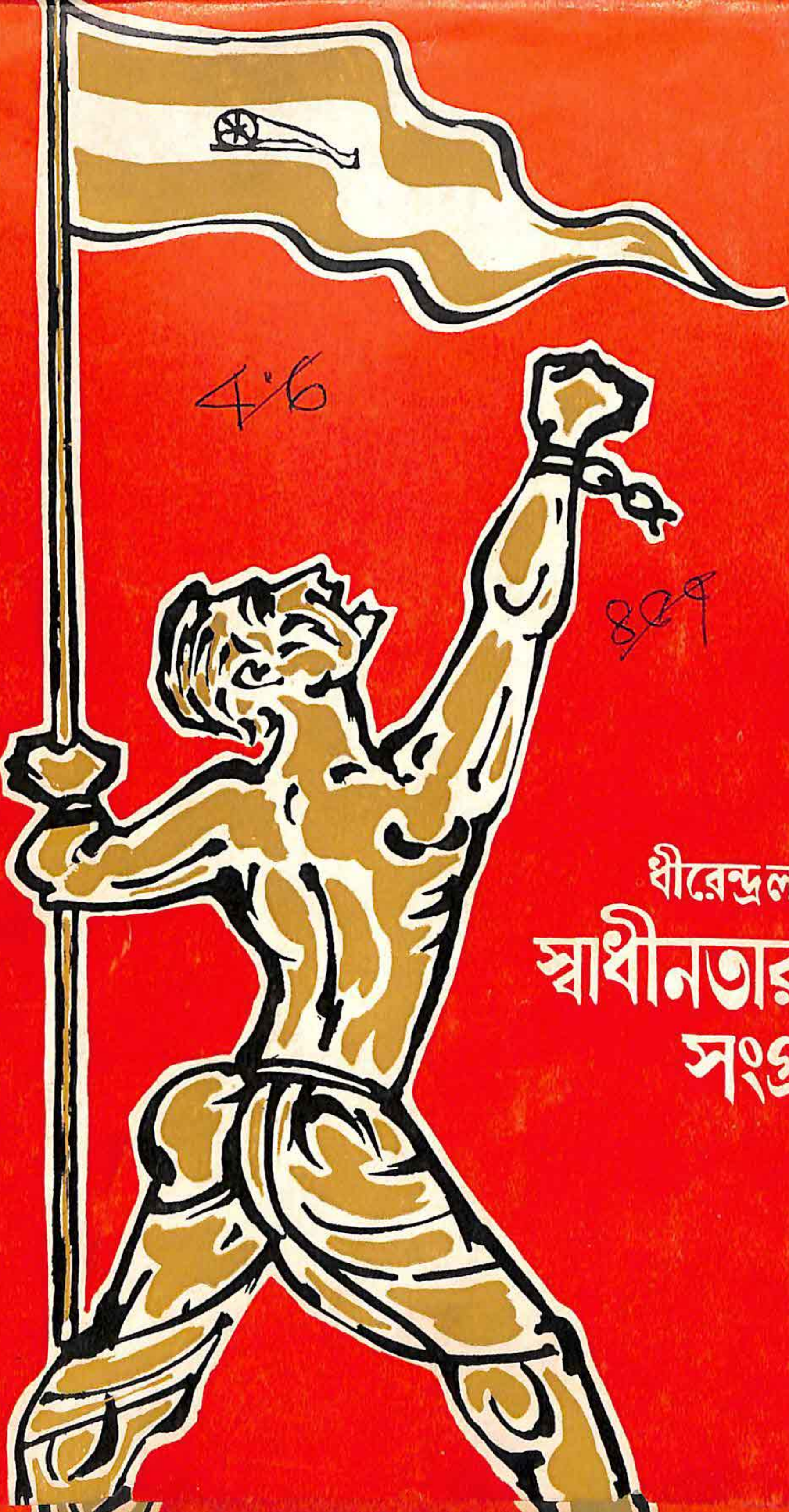


ধীরেন্দ্রলাল ধর

স্বাধীনতার সংগ্রাম

স্বাধীনতার সংগ্রাম

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা ১২

পরিবর্ধিত সংস্করণ : ২৫শে বৈশাখ : ১৩৭২

দাম : দশ টাকা

পুনর্লিখনে : শ্রীগীতা ধর
প্রচ্ছদ এঁকেছেন : শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী
ভিতরের ছবি : শ্রীরাধিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২
হইতে প্রকাশিত ও শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক কর্তৃক সাধারণ প্রেস
১৫এ ক্ষুদিরাম বসু রোড, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত

দ্বিধাহীন ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গে
যাঁরা স্বাধীনতার ভিত্তি রচনা করেছেন
সেই সব
খ্যাত-অখ্যাত দেশপ্রেমিকদের উদ্দেশ্যে
শ্রদ্ধা জানাই

স্বাধীন ভারতের ছেলেমেয়েদেরকে আজ শুধু নিজের দেশের কথা ভাবলেই চলবে না, সারা বিশ্বের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। বিভিন্ন দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আন্দোলনের সঙ্গে ভালো ভাবে পরিচিত হয়ে, আড়াই হাজার বছর আগেকার অহিংসা ও ভ্রাতৃত্বের বাণী নিয়ে যুদ্ধক্লান্ত জগতের বুকে মহত্তর মানব-সমাজ গড়ে তুলতে হবে,—যে সমাজের মানুষ স্বার্থের অহঙ্কারে অপরকে আঘাত করবে না, ত্যাগ, সত্য ও অপরিগ্রহে সমুজ্জল হয়ে উঠবে। বুদ্ধ, খৃস্ট, চৈতন্য ও গান্ধীজী যে মানবতাকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, আমাদেরকে আজ তা সম্পূর্ণ করতে হবে। সেই আদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখে এই বইখানিতে ভারত ও পৃথিবীর গণ-আন্দোলনের সঙ্গে ছোটদের চিন্তাধারার একটা যোগাযোগ ঘটিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি। তারা মূল সুরটা ধরতে পারলেই এবং বইখানি তাদের ভালো লাগলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হবে—লেখক।

সূচীপত্র ঃ

বিষয় ঃ		পৃষ্ঠা ঃ
আমার দেশ	...	১
কংগ্রেসের কথা	...	৪
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন	...	১৭
অসহযোগ আন্দোলন	...	২৭
আইন-অমান্য আন্দোলন		৩৩
ভারত-ছাড়ো আন্দোলন		৩৯
সশস্ত্র বিপ্লব	...	৫৫
আজাদ হিন্দ	...	৮৬
নৌ-বিদ্রোহ	...	৯২
দেশীয়রাজ্যে প্রজা আন্দোলন		৯৫
কৃষক আন্দোলন	...	১০১
কংগ্রেসের অধিবেশন	...	১০৩
স্বাধীনতার প্রতিজ্ঞা	...	১০৫
স্বাধীনতার আদর্শ	...	১০৮
স্বাধীনতার রূপ	...	১১০
জাতীয় পতাকা	...	১১২
জাতীয় সংগীত	...	১১৬
স্বাধীন ভারতের লাটসাহেব ও মন্ত্রিগণ	...	১১৮
খণ্ডিত ভারত	...	১২৩
স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্রের কথা	...	১২৪
কাজের কথা	...	১২৮
আমাদের স্মরণীয় দিন	...	১৩৪
সন্ন্যাসী বিদ্রোহ	...	১৩৯
সিপাহী বিদ্রোহ	...	১৪২
আমেরিকার স্বাধীনতা	...	১৪৬
ফরাসী বিপ্লব	...	১৪৮
ক্রীতদাসদের স্বাধীনতা		১৫০
রুশ বিপ্লব	...	১৫২
তুরস্ক বিপ্লব	...	১৫৫
চীন বিপ্লব	...	১৫৯
আয়র্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা	...	১৬২
ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা	...	১৬৫
সন্ধানী	...	১৬৯



আমার দেশ

আমাদের দেশ এই ভারতবর্ষ—পয়তাল্লিশ কোটি মানুষের দেশ। এই পয়তাল্লিশ কোটি মানুষের ভালো করার জন্য, সুখী করার জন্য সবচেয়ে বড় সঙ্ঘ গড়ে উঠেছিল, আমাদের জাতীয় মহাসভা,—এক কথায় কংগ্রেস।

কংগ্রেসকে বুঝতে হলে ভারতভূমিকে জানতে হবে।

ইউরোপ থেকে রুশিয়াকে বাদ দিলে যা থাকে, আমাদের দেশ ঠিক তত বড়। এদেশে এমন অনেক জেলা আছে যা ওদেশের এক-একটি রাজ্যের চেয়েও বড়। সুইট্জারল্যাণ্ড রাজ্যটি ময়মনসিং জেলার চেয়ে ছোট।

পৃথিবীতে যত লোক আছে, তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ থাকে এদেশে।

ভারতে গ্রাম আছে সাত লাখ।

ভারতবাসী শতকরা পঁচাত্তর জন চাষা, আটজন কারখানার মজুর, আর বাকী বাইশ জনের মধ্যে কেউ-বা ব্যবসায়ী, কেউ জমিদার, কেউ উকিল, কেউ ডাক্তার, কেউ কেরাণী আবার কেউ-বা শিক্ষক।

ভারতবাসীর আয় দৈনিক গড়ে একানব্বুই পয়সা। কারখানার অনেক মজুরকে ফুটপাতে শুয়েই রাত কাটাতে হয়। শতকরা ত্রিশ জন মানুষ দু'বেলা দু'মুঠো পেট ভরে খেতে পায় না।

এদেশে শতকরা সতেরো জন মাত্র লোক কোন রকমে নাম সই করতে পারে, আর বিলাতের লোক লেখাপড়া জানে শতকরা একশো জন।

ভারতবাসী বাঁচে গড়ে একত্রিশ বছর মাত্র, আর একজন ইংরেজ কি আমেরিকান বাঁচে বাষট্টি বছর। এদেশে কেবল জ্বরে ভুগেই ছত্রিশ লাখ লোক প্রতি বছর মারা যায়। যক্ষ্মা রোগী আছে পঁচিশ লক্ষ।

ভারতবর্ষ সোনার দেশ। পৃথিবীর শতকরা ২৬ ভাগ ধান, ২৩ ভাগ চা, ২২ ভাগ তামাক, ১৮ ভাগ চিনি, ১৫ ভাগ তুলো, ৭ ভাগ গম এদেশে জন্মায়। তবু এদেশের সব লোক দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় না। বছরে এক কোটি ছাব্বিশ লক্ষ টাকার খাদ্যশস্য বিদেশ থেকে কিনে এনে আমাদেরকে অন্নসংস্থান করতে হয়।

এদেশে এখনও ৪৫ কোটি বিঘা জমি অনাবাদা পড়ে আছে, আবাদ করার ব্যবস্থা নেই। ৩০ লাখ গাঁট তুলো আমরা বিদেশে বেচে ফেলি, কাপড় বোনার যথেষ্ট কল নেই। ২৮৬ লাখ টন কয়লা পুড়িয়ে নষ্ট করি, গ্যাস আলকাতরা রং তৈরী করার একটির বেশী কারখানা নেই। দশ লাখ টন লোহা বিদেশে বেচে ফেলা হয়, মোটর জাহাজ ইঞ্জিন এরোপ্লেন তৈরী করার এক-একটির বেশী কারখানা নেই।

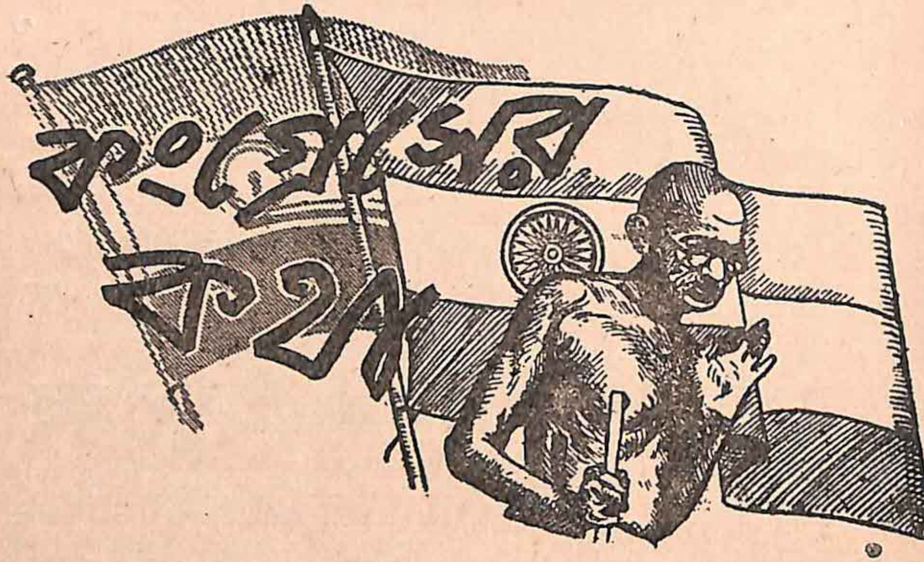
সাহেবরা বলে—'ভারতবর্ষে সম্পদ আছে প্রচুর, তবু এদেশের বাসিন্দারা বেজায় গরীব।' কিন্তু এই দারিদ্র্যের কারণ খুঁজতে গেলেই দেখা যাবে যে এদেশে বৃটিশ আমলে কলকারখানা খনি চা-বাগান ব্যাঙ্ক বীমা প্রভৃতি ব্যবসায়ে অর্ধেকের উপর মূলধন ছিল ইংরেজদের—৩১২০ কোটি টাকা; এই টাকার সুদ হিসাবে তারা প্রতি বছর বিলাতে নিয়ে গেছে ২৮০ কোটি টাকা। একে একরকম লুণ্ঠন বলা চলতে পারে।

এই দারিদ্র্যকে দূর করতে হলে—দেশকে গড়ে তুলতে হলে দেশের সব ব্যাপারে নিজেদের কর্তৃত্ব থাকা চাই, ইংরেজদের হাত থেকে সেই কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নিয়েছে কংগ্রেস। গত বাষট্টি বছর ধরে সেজন্য কংগ্রেসকে লড়তে হয়েছে।

কংগ্রেসেরও আগে—আজ থেকে নব্বুই বছর পূর্বে এদেশের

সিপাহীরা আর কয়েকজন রাজ্যহারা রাজা-রাণী একবার বিদেশী ইংরেজকে এদেশ থেকে তাড়াবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু দেশের সাধারণ লোক তাদের সঙ্গে যোগ দেয়নি, সেজন্য তাদের সে চেষ্টা সফল হয়নি। সে কাহিনী সিপাহী-বিদ্রোহ নামে ইতিহাসে খ্যাত হয়ে আছে। তারও শ'খানেক বছর আগে এদেশের সন্ন্যাসীরা ইংরেজদের হটাতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি।

সর্বসাধারণের সমর্থনে কংগ্রেস স্বাধীনতা-সংগ্রামে জয়যুক্ত হয়েছে, ভারত স্বাধীন হয়েছে।



কংগ্রেসের স্থষ্টি হয় ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে।

এর আগে এই ধরণের আরো ছুটি সম্মেলন হয়েছিল এই দেশে—হিন্দুমেলা ও ন্যাশন্যাল কনফারেন্স। কয়েকটি বড় বড় সঙ্ঘও গড়ে উঠেছিল—ইণ্ডিয়া লীগ, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রভৃতি; কিন্তু এদের কোনটিই কংগ্রেসের মত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি।

কংগ্রেসের বাষট্টি বছরের ইতিহাসকে আমরা মোটামুটি কয়েকটা যুগে ভাগ করে ফেলতে পারি ঃ আবেদন-নিবেদনের যুগ, অসন্তোষের যুগ, বঙ্গ-বিভাগের যুগ, অসহযোগের যুগ, আইন-অমান্যের যুগ ও ভারত-ছাড়োর যুগ।

প্রথম যুগের কংগ্রেস ছিল জনকয়েক সাহেব আর বিলাত-ফেরত ব্যারিস্টারদের সঙ্ঘ। বড়দিনের ছুটিতে সবাই মিলে সভা করলো, কয়েক-জন ভালো ভালো কয়েকটি বক্তৃতা করলো, কয়েকটি প্রস্তাব পাস করা হোল। কিন্তু সারা বছর ধরে এই প্রস্তাব মত কোন কাজ কিছু হোল না, খবরের কাগজের পাতাতেই সব রয়ে গেল। প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বক্তৃতায় বলেন—আমাদের উদ্দেশ্য, আমাদের সমাজে যে সব ছুর্নীতি আজ উন্নতির বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে কি ভাবে তা দূর করা যায় সেই উপায় উদ্‌ভাবন করা।

তখনকার কংগ্রেসী নেতারা বৃটিশের প্রজা হওয়া গৌরব বলে মনে করতেন, এবং বিশ্বাস করতেন, আমাদের আশা-আকাঙ্খার কথা ইংরেজদের ঠিক মত বুঝিয়ে দিতে পারলেই বৃটিশ-রাজ আমাদেরকে দেশ শাসনের অধিকার দেবেন।

১৮৯৭ খৃস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ ইউরোপ ও আমেরিকা জয় করে ফিরলেন। সাহেবরা যে সব বিষয়েই আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সে বিশ্বাস লোকের মন থেকে এবার চলে গেল।

তার উপর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বালগঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপৎ রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতি নেতারা খবরের কাগজে লিখে ও সভায় বক্তৃতা দিয়ে বৃটিশ শাসনের দোষ কোথায় তা দেখিয়ে দিতে লাগলেন ও জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ জাগিয়ে তুললেন।

এই সময় বোম্বাইয়ে প্লেগের মহামারী দেখা দেয়। এই মহামারী দমন করার জন্য এক সরকারী কমিটি বসে। সেই কমিটির অশিষ্ট ব্যবহার সহ্যের সীমা পার হয়ে যায়। লোকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে কমিটির সভাপতি মিস্টার র‍্যানড্ ও তাঁর কর্মচারী লেফ্‌টেন্যান্ট এয়ারেস্টকে খুন করে। খুনীরা ধরা পড়ে, তাদের ফাঁসী হয়। এই ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন বলে লোকমান্য তিলককেও জেল খাটতে হয়।

ভারতের সত্যিকারের অবস্থা ইংরেজদেরকে বুঝিয়ে দেবার জন্য মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে ও পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপৎ রায় বিলাতে যান। কিন্তু সেখানে বিশেষ কিছুই করতে না পেরে ফিরে এসে লালাজী বললেন—বিলাতের লোকেরা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। সেখানে কিছু করতে যাওয়া মানে আমাদের সময় আর পয়সা দুইই নষ্ট করা। আমাদের দেশেই আমাদের ভালো ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া দরকার।

বাংলাদেশ ছিল তখন জাতীয় আন্দোলনের অগ্রণী। গোখ্‌লে বলেছিলেন—আজ বাংলাদেশ যা করবে, কাল সারা ভারত তাই অনুসরণ করবে। বড়লাট লর্ড কার্জন সেই জন্য বাংলাদেশের সংহতি নষ্ট করার

চেষ্টা করলেন—দু'ভাগে বাংলাদেশ ভাগ করার কথা উঠলো। একদিকে ঢাকা, রাজসাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগ, আর একদিকে বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগ। বাঙালীরা এই ভাগগুলি মেনে নিতে পারলো না। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করলো।

কৃষ্ণকুমার মিত্র বিলিতী জিনিষ বয়কটের কথা তুললেন।

রবীন্দ্রনাথ রাখীবন্ধন উৎসবের কথা প্রচার করলেন (১৬ই অক্টোবর, ১৯০৫)।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সেদিন উপবাস করতে বললেন।

সুরেন্দ্রনাথ নির্দেশ দিলেন—সবাই হরতাল কর।

পরের বৎসর এই সম্পর্কে বরিশালে প্রাদেশিক সম্মেলন বসলো, পুলিশ তখন লাঠি চালালো। কংগ্রেসীরা বন্দেমাতম্ ধ্বনি করতে করতে ধরাশায়ী হোল, তবু পালালো না। বে-আইনী শোভাযাত্রা করার জন্য সুরেন্দ্রনাথের দু'শো টাকা জরিমানা হোল।

যুবকের দল এবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। বিপিনচন্দ্রের মামলার দিন আদালতে পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের দাঙ্গা হয়ে গেল। ছোটলাটের ট্রেন উড়িয়ে দেবার চেষ্টা হোল, জজ কিংস্‌ফোর্ডকে মারতে গিয়ে ক্ষুদিরাম বসু ফাঁসী গেল। মানিকতলায় বোমার কারখানা ধরা পড়লো। মদনলাল ধিংরা স্যার কার্জন ওয়াইলিকে গুলি করে মারলো। নাসিকের কালেক্‌টর মিস্টার জ্যাকসন্ খুন হোল। পুলিশ শেষ অবধি তিনশো খবরের কাগজ আর সাড়ে তিনশোটি ছাপাখানা বন্ধ করে দিল, সমস্ত নেতাদের ধরে বন্দী করলো।

এদিকে কংগ্রেসের ভিতরেও দু'টি দল দেখা দিল—নরমদল আর চরমদল। ১৯০৭ খৃস্টাব্দে সৌরাষ্ট্রে কংগ্রেসের যে বার্ষিক সম্মেলন বসলো সেখানে দু'দলে রীতিমত খণ্ডযুদ্ধ ঘটে গেল। চরমদল সুবিধা করতে পারলো না, নরমদলই জিতলো। নরমদলের ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ সে-সভায় সভাপতি হলেন।

অসন্তোষ ক্রমেই বেড়ে উঠছে দেখে, ভারত সরকার ভারতবাসীকে খুসি করার জন্য শাসন-ব্যবস্থার কিছু কিছু সংস্কার করলেন। এই

সংস্কারের নাম 'মর্লি-মিণ্টো রিফর্ম' (১৯০৯)। দু'বছরের মধ্যে বঙ্গ-বিভাগ রদ হলো (১৯১১)। তরুণদল কিন্তু এতো অল্পে সন্তুষ্ট হলো না, দিল্লীতে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জকে বোমা মারলো। অযোধ্যাবিহারী লাল ও আমীরচাঁদের ফাঁসীর আদেশ হোল, রাসবিহারী বসু পালিয়ে গেলেন।

১৯১৪ খৃস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধলো। বিপ্লবীরা সেই সুযোগে জার্মানদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে এদেশে জাহাজ ভর্তি অস্ত্র-শস্ত্র আনার চেষ্টা করলো। সেই অস্ত্র দিয়ে তারা ইংরেজদেরকে এদেশে থেকে তাড়াবে। এই উদ্দেশ্যে ভারতের বাইরে অনেকগুলি দল গড়ে উঠলো। লালা হরদয়াল আমেরিকায় 'গদর পার্টি' গড়লেন। ডাক্তার তারকনাথ দাস দল গড়লেন বার্লিনে, ওবেদুল্লা সিন্ধি ও বরকতউল্লা দল গড়লেন কাবুলে, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ ও রাসবিহারী বসু দল গড়লেন জাপানে। কিন্তু এতো করেও দেশে অস্ত্র এসে পৌঁছালো না, দু'জাহাজ অস্ত্র পথেই ধরা পড়ে গেল। বিপ্লবীদের নেতা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বালেশ্বরে পুলিশের সঙ্গে লড়াই করে নিহত হলেন। তিন আইনে সারা দেশব্যাপী ধর-পাকড় সুরু হোল।

দেশের আবহাওয়া বোঝবার জন্য ভারত-সচিব মণ্টেগু সাহেব এদেশে বেড়াতে এলেন। সাড়ে পাঁচ মাস ধরে সব দেখে শুনে ইান শাসন-নীতির আরো কিছু অদল-বদল করলেন, এদেশের লোককে আগের চেয়ে বেশী সুবিধা দিলেন (২৩শে ডিসেম্বর, ১৯১৯)। এই নতুন ব্যবস্থা নরমদলের অনেক নেতারই ভালো লাগলো, কেউ কেউ মন্ত্রীর চাকরী নিলেন, দু'একজনের বরাতে লাট-সাহেবীও জুটে গেল।

চরমদল কিন্তু এই ব্যবস্থা মেনে নিতে পারলো না, লোকমান্য তিলক ও আনি বেশান্ত 'হোমরুল' আন্দোলন সুরু করলেন। সাড়া তুললেন—আমাদের দেশ, আমরা শাসন করবো।

যুদ্ধ ইতিমধ্যে শেষ হোল। ইংরেজরা জিতলো। ইংরেজদের পক্ষে লড়তে গিয়ে এক লাখ ভারতীয় সৈন্য প্রাণ দিল, আর ভারতবর্ষ ১০০০ কোটি টাকার জিনিষ-পত্র জোগালো। এখন কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ভারতীয়দের

জন্য কংগ্রেস বেশী সুযোগ-সুবিধা দাবী করলো। কিন্তু সরকার 'রাউলাট আইন' জারী করে ষোল-শো লোককে জেলে ভরলো। দেশের লোকেরা প্রতিবাদ জানালো, সারা ভারতব্যাপী হরতাল হোল, পুলিশও গুলি চালালো। অবস্থা চরমে উঠলো পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালা-বাগে। জেনারেল ডায়ার দশ হাজার নরনারীর এক সভায় গুলি চালালো, তাতে প্রায় হাজার খানেক লোক হত ও হাজার দেড়েক লোক আহত হোল (১৩ই এপ্রিল, ১৯১৯)। ইংরেজ মহিলারা আবার এই নরহত্যার প্রশংসা করে চাঁদা তুলে ডায়ারকে তিন লাখ টাকা পুরস্কার দিল।

এরপর নরম দলের নেতাদের বলার মত আর কিছুই রইল না, চরম দল এবার কংগ্রেস দখল করলো এবং দক্ষিণ-আফ্রিকা-ফেরত মহাত্মা গান্ধী হলেন এদের নেতা। সরকারের সঙ্গে লড়াই বাধলো,—অস্ত্রের লড়াই নয়, অহিংসার লড়াই। দু-দফা কার্য-সূচী তৈরী হোল: বর্জন করতে হবে—বিলিতী জিনিস, লাট সাহেবের দরবার, সরকারী খেতাব, সরকারী আইন-আদালত, সরকারী শিক্ষালয়; গড়ে তুলতে হবে—জাতীয় শিক্ষালয়, সংগঠন করতে হবে সালিশী-পঞ্চায়েৎ, চরকা চালিয়ে নিজেদের কাপড় নিজেদেরই তৈরী করে নিতে হবে। কাজ সুরু হয়ে গেল, পুলিশের লাঠি খাওয়া আর জেলে যাওয়া নিত্যকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। শেষে জনতা একদিন আর সইতে না পেরে চৌরীচৌরার থানা জ্বালিয়ে দিল (ফেব্রুয়ারী, ১৯২২)। গান্ধীজী এই হিংসাকে সমর্থন করলেন না, আন্দোলন থামিয়ে দিলেন।

১৯২২ খৃস্টাব্দে গয়ায় কংগ্রেস বসলো। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও পণ্ডিত মতিলাল সেখানে নতুন দিকে কাজ করবার কথা তুললেন—কংগ্রেসীরা লাট-সাহেবদের দরবারে ঢুকে অন্যায় কাজের কঠোর সমালোচনা করে শাসন-ব্যবস্থাকে অচল করে তুলবেন। এই সম্পর্কে নেতা দু'জন নিজেদের এক নতুন দল গড়লেন—স্বরাজ্যদল।

১৯৩০ খৃস্টাব্দ অবধি স্বরাজ্যদল ভালোভাবেই কাজ চালালো।

গান্ধীজী এই সময় সারা ভাবতবর্ষ ঘুরে বেড়ালেন কংগ্রেসের কথা

প্রচার করে। ১৯২৯ খৃস্টাব্দে তিনি ঘোষণা করলেন—এক বছরের মধ্যে স্বাধীনতা আসবে।

পরের বছরেই তিনি সুরু করলেন লবণ-সত্যাগ্রহ (১২ই মার্চ, ১৯৩০)। যে-সব আইন ভারতবাসীকে পঙ্গু করে রেখেছে, জনসাধারণ এবার সেই সব আইন অমান্য করতে সুরু করলো। বাংলা ও গুজরাটের অনেক জায়গায় প্রজারা খাজনা দেওয়া বন্ধ করলো। পুলিশের অত্যাচারে অনেক লোক সর্বস্ব হারিয়ে পথে বসলো। মহিলা ও বালকেরা বন্দুকের সামনে নির্ভয়ে বুক পেতে দাঁড়ালো। অনেক পদস্থ সরকারী চাকুরিয়া সরকারের এই অত্যাচার দেখে চাকুরী ছেড়ে দিলেন। পেশোয়ারে গাড়োয়ালি সৈন্যরা অহিংস জনসাধারণের উপর অকারণে গুলি চালাতে অস্বীকার করলো।

ভারতের লোককে খুসি করার জন্য বিলাতে গোল-টেবিল-বৈঠক বসলো। কথা হোল—এই বৈঠকে ঠিক হবে ভারতবাসীকে কতখানি স্বাধীনতা দেওয়া যায়। কিন্তু প্রথম বৈঠকে কিছুই হোল না। দ্বিতীয় বৈঠকে গান্ধীজী, মদনমোহন মালব্য, সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি বিলাতে গেলেন, কিন্তু খুসি হয়ে ফিরতে পারলেন না। আইন-অমান্য আন্দোলন চলতে লাগলো। গবর্মেণ্ট কংগ্রেসী নেতাদেরকে আবার জেলে পুরলো।

বিপ্লববাদীরা কিন্তু তখনও কংগ্রেসের অহিংসা নীতি মেনে চলতে পারেনি। তখনও তারা বন্দুক ও বোমা নিয়ে অত্যাচারের প্রতিশোধ নিচ্ছিল। লাহোরের পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মিস্টার সান্‌ডাস্ গুলির আঘাতে খুন হোল। এই সম্পর্কে ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের ফাঁসী হোল। জেলের কর্তাদের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদ করে যতীন্দ্রনাথ দাস চৌষট্টি দিন উপবাস করে মৃত্যু বরণ করলেন।

১৯৩০ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুঠ হোল। এগারো জন রাজকর্মচারী খুন হোল। বাংলার ইনস্‌পেক্‌টার-জেনারেল মিস্টার লোম্যান্, বাংলার জেলসমূহের কর্তা কর্ণেল সিম্‌সন, মেদিনীপুরের জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার প্যাডি, চট্টগ্রামের ইনস্‌পেক্‌টার

খান-বাহাদুর আসানুল্লা, মুন্সীগঞ্জের স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট কামাখ্যা-প্রসাদ সেন, চট্টগ্রামের লেফ্‌টেন্যাণ্ট ক্যামেরণ বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হোল। বীণা দাস কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বাংলার লাটসাহেব স্টানলি জ্যাকসনের প্রতি গুলি চালালো, কুমিল্লায় মিস্টার স্টিভেন্স্‌কে মারার জন্য দুটি মেয়ে ধরা পড়লো—শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী। দার্জিলিঙে লাটসাহেবকে গুলি করে মারার চেষ্টা করে রবীন বাঁড়ুয্যে ও উজ্জ্বলা নামে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে ধরা পড়লো।

এবার ইংরেজরা তৃতীয় গোল-টেবিল-বৈঠক বসালো। 'শাদা কাগজ' (White paper) নামে ভারত-শাসন সম্পর্কে নতুন আইন পাস হোল (১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩)। নানা বিচার-বিবেচনা করে কংগ্রেসীরা 'শাদা কাগজের' ব্যবস্থা মেনে নিতে রাজী হলেন। বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেসী দল মন্ত্রী হয়ে বসলেন। বাংলা, পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে মুসলীম লীগ প্রাধান্য পেল।

১৯৩৯ খৃস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধলো। সুভাষচন্দ্র বললেন—ইংরেজ আজ বিপন্ন, এই বিপদের সুযোগে আমরা স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টা করি। কিন্তু গান্ধীদলের তা পছন্দ হোল না, সুভাষচন্দ্রকে তাঁরা কোণঠাসা করে ফেললেন। সুভাষচন্দ্রকে রাষ্ট্রপতির পদ ছাড়তে হোল। কিন্তু জনসাধারণ তখন ইংরেজ-বিদ্বেষী। ইংরেজকে যুদ্ধে সাহায্য করতে কেউ চাইল না, আটটি প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীরা মন্ত্রিত্ব ছাড়লেন। গান্ধীজী একক-সত্যাগ্রহের নির্দেশ দিলেন। এই সত্যাগ্রহ সুরু করলেন আচার্য বিনোবা ভাবে।

এদিকে জাপানীরা রেংগুন অবধি অধিকার করে বসলো, ভারতবর্ষ বুঝি এবার যায়। বিলাত থেকে তাড়াতাড়ি স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্‌কে এদেশে পাঠানো হোল, তিনি নানা ছলে ভারতবর্ষকে যুদ্ধে নামাতে চাইলেন, কিন্তু শেষ অবধি ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলেন। নেতারা বললেন—আগে আমাদের স্বাধীনতা চাই, লড়াইয়ের কথা উঠবে তারপরে।

গান্ধীজী এবার সাড়া তুললেন—ভারত ছাড়! পুলিশ সমস্ত

নেতাদেরকে গ্রেপ্তার করলো (৯ই আগস্ট, ১৯৪২)। ভারতের গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে—প্রতি জনপদে ছড়িয়ে পড়লো বিদ্রোহের আগুন। টেলিগ্রাফের তার কেটে দেওয়া হোল, রেল-লাইন উপড়ে ফেলা হোল, রাস্তা ভেঙ্গে দেওয়া হোল, থানা জ্বালিয়ে দেওয়া হোল—জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হোল অনেক জায়গায়। অনেক কংগ্রেসী নেতা আত্মগোপন করে, কেউ-বা জেল থেকে পালিয়ে বিপ্লবীদের নির্দেশ দিতে লাগলেন। মেদিনীপুর, দিনাজপুর, বালিয়া, সাতারা, ভাগলপুর প্রভৃতি জেলা ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে উঠলো। পথে ও প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়লো বৃটিশ মিলিটারী, —নারী ও শিশুকে রাজপথে গুলি করে হত্যা করলো, গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিল, কত ছাত্র ও মজুর প্রাণ দিল, তবু দেশের লোক মাথা নোয়ালো না, মুখে মনে এক কথা—'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে, করি কিংবা মরি।—ইংরাজকে না তাড়িয়ে ছাড়বো না!' এই সময় এলো মেদিনীপুরে ভয়াবহ বন্যা, আর তারই সঙ্গে ঘটলো সারা বাংলায় দুর্ভিক্ষ। চালের কারবারে লাখ লাখ টাকা লাভ করার জন্য চোরা-কারবারীরা এই দুর্ভিক্ষ ঘটিয়েছিল। এতে প্রায় পঞ্চাশ লাখ নরনারী ও শিশু মারা পড়লো। যারা এর প্রতিকারের চেষ্টা করলো, বাংলার মুসলীম-লীগ মন্ত্রীরা তাদেরকেও ধরে জেলে ভরলো।

য়ুরোপ ও এশিয়ায় যুদ্ধ তখন ঘোরতর। বিদেশীর সাহায্যে দেশকে যদি স্বাধীন করা যায়, এই ভেবে সুভাষচন্দ্র বসু পুলিশের চোখকে ফাঁকী দিয়ে কলকাতা থেকে (জানুয়ারী, ১৯৪১) পালিয়ে যান। জার্মানি ও জাপানে যে-সব ভারতীয় সৈন্য বন্দী হয়েছিল তাদের নিয়ে তিনি আজাদ হিন্দ্ সৈন্যদল গঠন করে ভারতের পূর্ব সীমান্ত আক্রমণ করলেন। আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হোল। জার্মানি, জাপান, ইতালি, আয়ারল্যাণ্ড ও অন্যান্য পাঁচটি দেশ সুভাষবাবুর প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ভারত-সরকারকে মেনে নিল। ইতিমধ্যে জাপানীরা মাদ্রাজ ও কলিকাতায় কয়েকবার বোমা ফেলে গেল।

গান্ধীজী এবার জেলে অনশন সুরু করলেন। সরকার গান্ধীজীকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন (৬ই মে, ১৯৪৪)। কয়েক মাসের মধ্যে কংগ্রেসের অন্যান্য নেতারাও মুক্তি পেলেন। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের জন্য তাঁরা দেশবাসীর প্রশংসা করলেন।

এদিকে তো জাপান জার্মানি ইতালি হেরে গেল। আজাদী সৈন্যকেও পরাজয় মেনে নিতে হোল। সুভাষচন্দ্র এরোপ্লেন দুর্ঘটনায় নিরুদ্দেশ হলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের বন্দী করে এনে এদেশে বিচার সুরু হোল। কিন্তু সারা ভারতে এদের মুক্তি দাবী করে এমন আন্দোলন সুরু হয়ে গেল যে, ভারত-সরকার শেষ অবধি সকলকেই ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন।

এর পরে ভারতের ভিতরেই নৌবাহিনী বিদ্রোহ করলো (২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬)। বোম্বাই ও করাচি বন্দর তারা দখল করে ফেললো। রীতিমত লড়াই হোল, কত মজুর ও মধ্যবিত্ত মিলিটারীর গুলিতে প্রাণ হারালো। সারা দেশ বিদ্রোহী নাবিকদের প্রতি সহানুভূতি জানালো। শেষে কংগ্রেসী নেতারা মধ্যস্থ হয়ে বিদ্রোহীদের শান্ত করলেন।

বিলাতে মন্ত্রীসভা বদলে গেল, চার্চিলের চেয়ারে বসলেন মিস্টার এ্যাট্লি। এঁরা ভারতের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করার চেষ্টা করলেন। ইংলণ্ড থেকে পার্লামেন্টের একদল সদস্য এলো এদেশে বেড়াতে। সব দেখে-শুনে গিয়ে তারা বললো—ভারতবর্ষ এতদিনে স্বাধীনতা পাবার উপযুক্ত হয়েছে। বিলাত থেকে এবার ক্যাবিনেট মিশন এলো—লর্ড প্যাথিক লরেন্স, স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্‌ ও আলেকজাণ্ডার। ভারতকে স্বাধীনতা দেবার কথা তাঁরা পাকা করলেন এবং স্বাধীন ভারতের আইন-কানুন তৈরী করার জন্য গণ-পরিষদ গঠিত হোল। যতদিন না নিয়ম-কানুন তৈরী হয় ততদিনের জন্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ভারতের প্রধান মন্ত্রী হলেন, তাঁর সঙ্গে রইলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদ, শরৎচন্দ্র বসু, রাজাগোপালাচারী, ডাক্তার জন মাথাই,

আসফ আলি, সি-এইচ্-ভাবা, জগজীবন রাম, সর্দার বলদেব সিং, স্যার সাফাৎ আমেদ খাঁ ও আলী জহির (২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬)।

এই সময় মুসলীম লীগের সঙ্গে কংগ্রেসের বিরোধ মারাত্মক হয়ে উঠলো। এই বিরোধের মধ্যে ইংরেজের হাত আছে অনেকখানি। ইংরেজ এদেশ দখল করে বসলেও মুসলমানরা তাদেরকে ভালচোখে দেখতে পারেনি, ভারতে আবার মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তারা সৃষ্টি করে এক বিদ্রোহ—ওহাবী আন্দোলন। এই আন্দোলন ইংরেজরা দমন করলো এবং হিন্দুদেরকে সব বিষয়েই বেশী সুযোগ-সুবিধা দিতে সুরু করলো।

দেখতে দেখতে মুসলমানরা অনেক পিছিয়ে পড়লো। এই সময় মুসলীম সমাজের নেতা ছিলেন স্যার সৈয়দ আমেদ। তিনি নির্দেশ দিলেন—ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা কর, হিন্দুদের অধিকার খর্ব কর! স্যার সৈয়দ বললেন—কংগ্রেসের নীতি মুসলমানদের স্বার্থের বিরোধী, কোন মুসলমানেরই কংগ্রেসে যোগ দেওয়া উচিত নয় (১৮৯৭)। ইংরেজরা এই রকমই চেয়েছিল, সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ ও সিপাহী-বিদ্রোহের সময় তারা দেখেছে, হিন্দু-মুসলমান এক হ'য়ে দাঁড়ালে কি মারাত্মক দুর্যোগ ঘটে; কাজেই দুটো সম্প্রদায়ের মধ্যে যত বিরোধ থাকে ততই ভালো। হিন্দুরা এই কৌশল বুঝলো, তারা হিন্দু-মুসলমানকে একত্র করার জন্য চেষ্টা করলো। খিলাফৎ আন্দোলনকে তারা জাতীয় আন্দোলন বলে ধরে নিলো, অনেক মুসলমান কংগ্রেসে এসে যোগ দিল। হাকিম আজমল খাঁ (১৯২১), মৌলানা আবুল কালাম আজাদ (১৯২৩, ১৯৪০-৪৫), মৌলানা মোহম্মদ আলি (১৯২৩), ডাক্তার আন্সারী (১৯২৭), প্রভৃতি কংগ্রেসের সভাপতি হলেন।

কিন্তু এই মিলন স্থায়ী হোল না। ১৯২৪ খৃস্টাব্দে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাধলো, দাঙ্গা থামাবার জন্য দিল্লীতে মৌলানা মোহম্মদ আলির বাড়ীতে গান্ধীজী একুশ দিন উপোস করলেন। ১৯২৬ খৃস্টাব্দে আবার দাঙ্গা বাধলো। স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে এক মুসলমান যুবক গুলি করে হত্যা

করলো। দু'দলের নেতারা সম্মিলিত হলেন; তাতে ঠিক হোল— মস্‌জিদের সামনে হিন্দুরা বাজনা বাজাবে না, মুসলমানেরা কোনও প্রকাশ্য স্থানে গরু-কোরবানি করবে না। কিন্তু লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার সময় আবার দাঙ্গা বাধলো। ভগৎ সিং, শুকদেব প্রভৃতির ফাঁসী হলে ভারতব্যাপী হরতাল ঘোষণা করা হয়। মুসলমানেরা তাতে যোগ দিল না, তা থেকেই বাধলো এই দাঙ্গা (১৯৩১)। কংগ্রেসী নেতা গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থী নিষ্ঠুরভাবে নিহত হলেন।

ইংরেজরা এই বিরোধকে পাকা করার জন্য মুসলমানদের জন্য আলাদা নির্বাচনের ব্যবস্থা করলেন। মুসলমান নেতা মহম্মদ আলি জিন্না বললেন—মুসলমানদের জন্য নিজস্ব রাষ্ট্র চাই। কংগ্রেস হিন্দু প্রতিষ্ঠান, তারা যদি ভারতকে স্বাধীন করে তাহলে ভারতবর্ষ হিন্দু রাষ্ট্র হবে, এবং ভারতের আট কোটি মুসলমান চিরদিনের জন্য হিন্দুদের ক্রীতদাস হয়ে থাকবে।

জিন্না সাহেব গোল-টেবিল বৈঠকেও সেই দাবী তুললেন। জিন্না যা চান গান্ধীজী তা-ই দিতে রাজী হলেন, তবু জিন্না সাহেব কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করলেন না। ১৯৩৫ খৃস্টাব্দে আবার দাঙ্গা বাধলো। এই দাঙ্গায় শিখদের সঙ্গেও মুসলমানদের সংঘর্ষ বাধলো শহীদগঞ্জের গুরুদ্বার নিয়ে।

১৯৩৭ খৃস্টাব্দে মুসলমানরা বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের বিরুদ্ধে আপত্তি তুললো। তাদেরকে খুসি করার জন্য কংগ্রেসীরা জাতীয়-সঙ্গীতকে ছাঁটাই করলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ নিয়ে মুসলমানেরা বহ্নি-উৎসব করলো। পাণিপথ ও আমেদাবাদে ছোটখাটো দাঙ্গা হোল। পরের বছর আবার দাঙ্গা বাধলো। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মুসলমানদের খুসি করার জন্য তাঁদের প্রতীক চিহ্ন পদ্ম থেকে 'শ্রী' লেখাটি তুলে দিলেন। তবু ১৯৩৮, ১৯৩৯, ১৯৪০, ১৯৪১—সুক্কুর, কুল্‌টি, বোম্বাই, আমেদাবাদ ও ঢাকা—দাঙ্গার আর শেষ নাই।

এই সময় মুসলীম লীগ 'পাকিস্তানের' কথা তোলে। এই শব্দটি স্যার মহম্মদ ইকবালের সৃষ্টি। এর মূল কথা হোল—মুসলমানেরা ভিন্ন জাতি,

তাদের সংস্কৃতি ভিন্ন, হিন্দুদের সঙ্গে তারা এক হয়ে থাকবে না, ভারতবর্ষেই আলাদা মুসলীম রাষ্ট্র গড়বে, বাইরের অন্যান্য মুসলীম রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে তাদের মিতালি হবে, তারা গড়ে তুলবে 'বিশ্ব মুসলীম সৌভ্রাতৃ-সঙ্ঘ।'

১৯৩৭-এর নতুন আইনে ভারতের কয়েকটি প্রদেশে মুস্লীম-লীগ মন্ত্রিত্ব দখল করে বসলো—সিন্ধু, পাঞ্জাব ও বাংলায়। এরা যুদ্ধের ব্যাপারে ইংরেজদের সঙ্গে রীতিমত সহযোগিতা করতে লাগলো। এদেরই মন্ত্রিত্বের আমলে বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ঘটে।

১৯৪৪ খৃস্টাব্দে পাকিস্তান সম্পর্কে রাজাগোপালাচারী মিস্টার জিন্নার সঙ্গে আলোচনা করেন। গান্ধীজী এবং জওহরলালও পরে সেই আলোচনায় যোগ দেন, কিন্তু কেউই জিন্নাকে খুসি করতে পারেননি। জিন্নার সেই এক কথা—ভারতীয় মুসলমানেরা ভিন্ন জাতি, তাদের জন্য ভিন্ন শাসন-ব্যবস্থা করতে হবে।

স্বাধীনতা পাবার কথা উঠতেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুসলীম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণা করলো (১৬ই আগস্ট, ১৯৪৬)। বাংলার লীগ-মন্ত্রীদের সমর্থনে কলিকাতার বুকে 'নাদিরশাহী' হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল। কলিকাতা থেকে দাঙ্গা গেল নোয়াখালি, নোয়াখালির পর বিহার, বিহার থেকে পাঞ্জাব, পাঞ্জাব থেকে সীমান্ত প্রদেশ। মহাত্মাজী এই রক্তপাত শান্ত করার চেষ্টায় নোয়াখালি ও বিহারের গাঁয়ে গাঁয়ে পায়ে হেঁটে ঘুরলেন। হিন্দু-মুসলমান গুণ্ডাদের সংযত করতে গিয়ে লালমোহন, সমীরুদ্দিন, সুখেন্দু বিকাশ, যশোদা, লাসিম, সর্বেশ্বর ডালু, শচীন মিত্র প্রভৃতি প্রাণ দিলেন।

ইতিমধ্যে কংগ্রেসের অগ্রগতিকে খর্ব করার জন্য বড়লাট ওয়াভেল চক্রান্ত করে মুসলীম লীগের পাঁচজন প্রতিনিধিকে মন্ত্রিমণ্ডলীতে গ্রহণ করলেন—লিয়াকত আলি খাঁ, গজনফর আলি খাঁ, আই-আই চুন্দ্রিগড়, সর্দার আব্দুর রব নিস্তার ও যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। এদের জন্য শরৎচন্দ্র বসু, স্যার সফাৎ আমেদ খাঁ ও আলি জহিরকে পদত্যাগ করতে হলো।

কিন্তু শেষ অবধি কংগ্রেসের চাপে ওয়াভেলকে চাকরী ছাড়তে হোল। লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন বড়লাট হয়ে এলেন। ভারতবর্ষকে কেটে দু'ভাগ করা হোল। মুসলীম-লীগ প্রধান অঞ্চলের নাম দেওয়া হোল পাকিস্তান ডোমিনিয়ন। ভারতের দু'দিকে তার দুটি অংশ পড়লো,—পূর্বদিকে পূর্ববঙ্গ ও শ্রীহট্ট, আর পশ্চিম দিকে সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্থান ও পাঞ্জাবের পশ্চিমাংশ। ভারতের বাকীটুকু নিয়ে হোল ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র। জিন্না সাহেব পাকিস্তানের বড়লাট হলেন।

১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে বৃটিশ গবর্মেণ্ট ভারতবাসীকে স্বাধীনতার মর্যাদা দিল। আমেরিকা, চীন ও রুশিয়ায় ভারতবর্ষ রাষ্ট্রদূত পাঠালো,—আসফ আলি, কে. পি. এস্. মেনন ও বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকে। গণ-পরিষদে সংবিধান তৈরী হোল—কি করে এদেশে গরীবদের সুখী করা যায়—'কিষাণ-মজদুর-প্রজারাজ' সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু মুসলীম লীগের আক্রোশ মেটেনি। কাথিয়াবাড়ের ছোট একটি রাজ্য জুনাগড় নিয়ে তারা গোলমাল সৃষ্টি করলো। তবে সুবিধা হোল না, শ্যামলদাস গান্ধীর নেতৃত্বে প্রজারা নবাবকে দেশছাড়া করলো। এবার সুরু হোল কাশ্মীর আক্রমণ, বহু অনাচার ও নরহত্যার পরে মহারাজ হরিসিং ভারতীয় সৈন্যদের সেখানে ডেকে পাঠালেন। ভারতীয় বিমান-বাহিনীর সামনে পাকিস্তানী হানাদাররা পরাজয় মেনে পালিয়ে গেল। কিন্তু একেবারে ছেড়ে গেল না। বৃটিশের মধ্যস্থতার ফলে পশ্চিমের খানিকটা অংশে তারা রয়ে গেল। সেইখান থেকে তারা কাশ্মীরে নানা রকম গোলযোগ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। এবার নিজাম রাজ্য, যশোলমীর ও ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্তে গোলযোগের সম্ভাবনা দেখা দিল। সর্দার বল্লভভাই সমস্ত সামন্ত রাজ্যগুলি আয়ত্তে নিয়ে এলেন।

এইভাবে নানা দুর্যোগের ভিতর দিয়ে স্বাধীনতার পথে যাত্রা সুরু হোল। কংগ্রেসের লক্ষ্য—গান্ধিজীর আদর্শ জয়যুক্ত হোক,—আজ আমরা যে যতটুকু পারি সেই দিকেই যেন চেষ্টা করি।

জয় হিন্দ্



বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলন

এদেশের হিন্দু ও মুসলমানরা যেন এক হতে না পারে সেদিকে ইংরেজদের চেষ্টা ছিল অনেক দিন থেকে। বড়লাট লর্ড কার্জন এজন্য বাংলা-দেশকে দু'ভাগে ভাগ করার ব্যবস্থা করলেন—হিন্দু-প্রধান বাংলা, আর মুসলমান-প্রধান বাংলা। ঢাকায় এক সভা ডেকে মুসলমানদেরকে বুঝিয়ে বললেন—মুসলমানদের সুবিধার জন্যই তিনি বাংলাদেশ ভাগ করছেন, পূর্ববঙ্গে হিন্দুর চেয়ে মুসলমানই বেশী, পূর্ববঙ্গ একটি আলাদা প্রদেশ হলে মুসলমানদেরই অনেক বেশী সুবিধা হবে।

বাঙালীকে কিন্তু এতো সহজে বোঝানো গেল না। সমস্ত বাংলা-দেশ এর প্রতিবাদে মাথা তুলে দাঁড়ালো। যেদিন বাংলাদেশকে ভাগ করা হবে, সেদিন সব কাজকর্ম বন্ধ রেখে বাঙালীরা প্রতিবাদ করলো—বাংলাদেশকে আমরা ভাগ হতে দেব না। রবীন্দ্রনাথ গাইলেন :—

বাংলার মাটী, বাংলার জল,
বাংলার হাওয়া, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক হে ভগবান—

বাংলার ঘর, বাংলার হাট
বাংলার বন, বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক,
পূর্ণ হউক হে ভগবান—
বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা
বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক,
সত্য হউক হে ভগবান—
বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক, এক হউক,
এক হউক হে ভগবান—

সারা বাংলাদেশে জোয়ার জাগলো। বাঙালীরা সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে পরস্পরের হাতে রাখী বাঁধলো।

কৃষ্ণকুমার মিত্র নির্দেশ দিলেন—বিলিতী জিনিষ বর্জন করুন, স্বদেশী গ্রহণ করুন।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বললেন—ঘরের থাকতে পরের নোব না। পরের দুয়ারে ভিক্ষা করবো না।

রজনীকান্ত সেন সংকীর্তন শোনালেন—

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নেরে ভাই
দীন দুঃখী মা যে তোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই।
সেই মোটা সূতোর সঙ্গে
মায়ের অপার স্নেহ দেখতে পাই;
আমরা এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ওই
পরের দোরে ভিক্ষা চাই।

ওই, ও দুঃখী মায়ের ঘরে
তোদের সবার প্রচুর অন্ন নাই,
তবু, তাই বেচে, কাচ সাবান মোজা
কিনে করলি ঘর বোঝাই।
আয়রে আমরা মায়ের নামে
এই প্রতিজ্ঞা করবো ভাই,
পরের জিনিষ কিনবো না
যদি মায়ের ঘরের জিনিষ পাই।

সারা দেশে বিলিতী জিনিষ বিক্রী প্রায় বন্ধ হয়ে এলো। ছেলের দল এদিকে কোমর বেঁধে লেগে গেল, নানা সঙ্ঘ ও সভা-সমিতি গড়ে উঠলো—ব্রতী সমিতি, বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায়, সন্তান সম্প্রদায়, স্বদেশী মণ্ডলী, স্বদেশ-বান্ধব সমিতি, সুহৃৎ সমিতি—এমনি আরো কত।

ইংরেজ ব্যবসাদার জাত, ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায় দেখে তাদের টনক নড়লো, তারা আইন দিয়ে বাংলাদেশকে বাঁধবার চেষ্টা করলো। তিনটি নির্দেশনামা জারী হোল—ভারত সরকারের 'রিজলী সার্কুলার', পশ্চিমবঙ্গে 'কার্লাইল সার্কুলার', পূর্ব-বঙ্গে 'লায়ন সার্কুলার'। সরকার জানালেন—রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামানোর জন্য ছাত্রদের পড়াশুনা কিছুই হচ্ছেনা, ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ইস্কুলের কর্তারা নজর রাখবেন, ছাত্রেরা যেন স্বদেশী আন্দোলন ও বিদেশী বর্জন প্রভৃতি কোন রাজনৈতিক ব্যাপারে যোগ না দেয়। এই সব ব্যাপারে ছাত্রদের প্রশ্রয় দিলেই ইস্কুলে যে সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়, তা বন্ধ করে দেওয়া হবে। বিদ্যালয়ের কর্তারা যদি ছাত্রদের মানিয়ে নিতে না পারেন, তাহলে অবাধ্য ছাত্রদের নাম তাঁরা যেন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠিয়ে দেন। তারপর যা করা দরকার গবর্মেণ্ট করবেন।

বাংলাদেশের ছাত্রেরা এর উত্তর দিল। এন্টি-সার্কুলার-সোসাইটি গড়ে তুললো, ঠিক করলো গবর্মেণ্টের এই নির্দেশ-নামা তারা মানবে না।

সাহেবরা মার-মুখো হয়ে উঠলো।

মাদারীপুরে ক্যাটেল্ নামে পাটকলের এক সাহেব পথ দিয়ে যাচ্ছিল। দুপুর রোদ। একটি ছেলে ছাতা মাথায় দিয়ে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। সাহেব তো রেগেই আগুন, সাহেবের সামনে ছাতা মাথায় দিয়ে যায়, এতো স্পর্ধা! তখনই ছেলেটিকে ধরে সেখানেই ঘা কতক বসিয়ে দিলে। এমন মার হোল যে বেচারাকে ডাক্তার ডাকতে হোল। ডাক্তারকে সাক্ষী করে ছেলেটি ক্যাটেলের নামে নালিশ করলো। ফরিদপুরে মামলা হোল। ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন সাহেব। সব শুনে তিনি রায় দিলেন—ক্যাটেল্ নির্দোষ, ছেলেটিরই দোষ, ছাতা মাথায় দিয়ে সে-ই ক্যাটেল্‌কে উত্তেজিত করেছে!

কোর্ট থেকে ক্যাটেল্ ছাড়া পেয়ে গেল। ছেলেরা কিন্তু তাকে ছাড়লো না, একদিন পথের মাঝে ধরে উত্তম-মধ্যমের ব্যবস্থা করলো। এবার ক্যাটেল নালিশ করলো ছেলেদের নামে। সাহেবকে প্রহার! তখনই ইস্কুল-ইনস্‌পেক্‌টার স্টেপ্‌ল্‌টন্ সাহেব তদন্ত করলেন। তিনটি ছেলেকে এই হাঙ্গামার সর্দার বলে তিনি স্থির করলেন। হুকুম দিলেন: তাদের প্রত্যেককে দেড়শো টাকা করে জরিমানা দিতে হবে। তারপর হেডমাস্টার মশাই নিজে হাকিমের সামনে এক-একটি ছেলেকে ধরে পঁচিশ ঘা করে বেত মারবেন।

সেই ইস্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত, তিনি বললেন— আমি এসব পারবো না।

স্টেপল্‌টন্ বললেন—তাহলে আপনার ইস্কুলে সরকারী সাহায্য বন্ধ হয়ে যাবে!

তা হোক, কিন্তু কয়েকটি টাকার জন্য অন্যায়ের কাছে মাথা নোয়াবার মত মানুষ কালীবাবু ছিলেন না।

আর এক দিনের কথা। রংপুরে এক স্বদেশী সভা হয়। সেখানকার যত ইস্কুলের ছেলে সবাই সেই সভায় উপস্থিত ছিল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব খবর পেয়েই জেলা ইস্কুল আর টেক্‌নিক্যাল ইস্কুলের দেড়শো ছাত্রের পাঁচ টাকা করে জরিমানা করে দিলেন।

ঢাকার ছেলেরা বঙ্গ-ভঙ্গের প্রতিবাদ করে একদিন উপবাসী থেকে খালি পায়ে ইস্কুলে গিয়েছিল, তাদের অনেকেরই জরিমানা দিতে হোল, কাউকে আবার ইস্কুল থেকে তাড়িয়েও দেওয়া হোল।

এই সব ছাত্রদের জন্য একটা কিছু করা দরকার। নেতারা স্বদেশী ভাবে শিক্ষা দেবার কথা তুললেন। সুবোধচন্দ্র বসুমল্লিক এক লাখ টাকা দিয়ে জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের পত্তন করলেন। দেশের লোক জয়-জয়কার করে তাঁকে 'রাজা' খেতাব দিয়ে দিল। জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী আরো টাকা দিয়ে পরিষদকে কার্যকরী করে তুললেন।

এদিকে কলিকাতার ছাত্রেরা বড়বাজারে বিলিতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করতে সুরু করলো।

অশ্বিনীকুমার দত্ত ছিলেন বরিশালের মুকুটহীন রাজা। তাঁর নির্দেশে বরিশালে বিলিতী জিনিষ কেনা-বেচা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। বরিশালের লোকেরা সাহেবদেরকে জিনিষ বেচা বন্ধ করে দিল, কোন সাহেবকে একটি ডিম কি একখানা বিস্কুট কিনতে হলে অশ্বিনীবাবুর ছাড়-পত্র চাই, না হলে কোন দোকানদার বেচবে না। সাহেবরা প্রমাদ গনলো। ম্যাজিস্ট্রেট ক্ষেপে গিয়ে বিলিতী জিনিষের বাজার বসিয়ে দিলেন। কিন্তু বাজারের ঘরগুলি খালিই পড়ে রইল, সেখানে না বসলো কেউ বেচতে, না এলো কেউ কিনতে।

সব দেখে শুনে ছোটলাট বামফিল্ড ফুলার গেলেন ঢাকায়। তাঁকে সম্মান দেখাতে জন কয়েক সরকারী কর্মচারী ছাড়া আর কেউ স্টেশনে গেল না। লাটসাহেবের মোট বইবার জন্য একটা কুলিও পাওয়া গেল না।

ওদিকে বিপিনচন্দ্র পালও সেদিন ঢাকায় এসে পৌঁছালেন। স্টেশনে সারা শহর ভেঙে পড়লো তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য। হাজার হাজার ছেলে সাড়া তুললো—বন্দেমাতরম্!

লাটসাহেব তো ক্ষেপে উঠলেন, আইন করে বন্দেমাতরম্ বলা নিষিদ্ধ করলেন। কিন্তু ছেলের দল আইন মানবে কেন, সাহেব দেখলেই চীৎকার

তোলে—বন্দেমাতরম্! সাহেবরাও চাবুক বাগিয়ে ধরে তাদের পিছনে ছোটে ঠেঙ্গাতে।

স্টীমলঞ্চে লাটসাহেব এলেন বরিশালে। সেখানকার সব খবর শুনে ফুলার সাহেব বরিশালের সব নেতাদের তলব করলেন নিজের লঞ্চে।

অশ্বিনী দত্ত, রজনী দাস, দীনবন্ধু সেন প্রভৃতিকে লাটসাহেব রীতিমত ধমকিয়ে দিলেন। ঘোষণা করলেন—বরিশাল 'প্রক্লেম্ড্ ডিস্ট্রীক্ট্'—আইন ভঙ্গকারী অঞ্চল।

শহরে স্থানে স্থানে গুর্খা সৈন্য মোতায়েন করা হোল।

এতো করেও কিন্তু বরিশালের মানুষগুলোকে আয়ত্তে আনা গেল না। এক এক বছর এক এক জেলায় বঙ্গীয়-প্রাদেশিক সম্মেলন বসতো, সে বছর সম্মেলন বসলো বরিশালে। কলিকাতা থেকে প্রতিনিধিরা বরিশালে গিয়ে পৌঁছালে সভাপতিকে নিয়ে বিরাট শোভাযাত্রা বেরুলো। পুলিশ এসে নেতাদেরকে বললো—সাবধান, বন্দেমাতরম্ ধ্বনি যেন না হয়, প্রলয় ঘটবে।

কিন্তু তরুণ প্রতিনিধিরা এই আদেশ মেনে নিতে পারলো না। পথে নেমেই তারা সাড়া তুললো—বন্দেমাতরম্! পুলিশও তৈরী ছিল। তাদের হাতের লাঠিও পড়তে সুরু করলো অগ্রগামীদের মাথায়। যত লাঠি পড়ে তত জোরে সাড়া ওঠে—বন্দেমাতরম্!

লাঠি মারতে মারতে পুলিশ চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতাকে ফেলে দিল এক পুকুরে, তখনও তিনি বন্দেমাতরম্ বলছেন। সেই সময় আরেক জন পুলিশ এসে তাঁকে জল থেকে না তুললে তিনি সেদিন জলে ডুবেই মারা যেতেন।

অনেকেই সেদিন পুলিশের হাতে রীতিমত মার খেয়েছিল, তাদের মধ্যে ফণী বাঁড়ুয্যে, বেচারাম লাহিড়ী ও ব্রজেন গাঙ্গুলীর আঘাত হয়েছিল গুরুতর।

শোভাযাত্রার শেষ দিকে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে বরাবর নিয়ে এল ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাড়ীতে। সেইখানে

তখনই হাকিম বিচার করে দিলেন—বে-আইনী শোভাযাত্রা পরিচালনা করার জন্য দু'শো টাকা জরিমানা দিতে হবে।

সুরেন্দ্রনাথ একখানি চেয়ার টেনে বসতে যাওয়ায় আরো দু'শো টাকা জরিমানা করা হোল।

তখনই টাকা দিয়ে সুরেন্দ্রনাথ সভায় চলে এলেন। যারা পুলিশের হাতে মার খেয়েছিল, তারাও মাথায় হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে সভায় এসে দাঁড়ালো। তাদের অবস্থা দেখে সভার লোকেরা চঞ্চল হয়ে উঠলো। ভূপেন্দ্রনাথ বসু বললেন—আজ থেকে ভারতে বৃটিশ রাজত্বের অবসান সূচিত হোল!

তুমুল উত্তেজনার মধ্যে সভা শেষ হোল। ফেরার পথে প্রতিনিধিরা সমস্ত পথ বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে মুখরিত করে তুললেন, কিন্তু এবার আর পথে পুলিশ দেখা গেল না।

পরদিন আবার সম্মেলন বসার কথা। কিন্তু তার আগেই পুলিশ এসে জানালো—রাস্তায় বন্দেমাতরম্ বলা চলবে না, সভাপতিকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে, না হলে সভা করতে দেওয়া হবে না।

কিন্তু সভাপতি এই প্রতিশ্রুতি দিতে রাজী হলেন না, বরিশাল সম্মেলন সেইদিন সেইখানেই শেষ হোল।

যুবকের দল এবার ক্ষেপে উঠলো। প্রবীণ নেতারা যেভাবে ইংরেজদের কাছে আবেদন-নিবেদন করছিল, এটা তাদের কাছে আর ভালো লাগলো না, তারা বললো—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—স্বাধীনতা ভিক্ষা করে পাওয়া যায় না। তারা শিবাজী উৎসবের আয়োজন করলো; বোম্বাই থেকে চরমপন্থী নেতা বালগঙ্গাধর তিলককে নিমন্ত্রণ করে আনলো। সঙ্গে এলেন গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থী ও ডাক্তার মুঞ্জে। কলিকাতার ত্রিশ হাজার ছেলে তিলককে নিয়ে এক শোভাযাত্রা বের করলো (১০ই জুন)। তিলক ঘোষণা করলেন—স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার!

তিলককে সম্বর্ধনা জানিয়ে এই উৎসবে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—

মারাঠির সাথে আজি হে বাঙালী এক কণ্ঠে বলো
—জয়তু শিবাজী!

মারাঠির সাথে আজি হে বাঙালী এক সাথে চলো
মহোৎসবে সাজি।
আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম পূরব
দক্ষিণে ও বামে
একত্র করুক ভোগ এক সাথে একটি গৌরব
এক পুণ্য নামে।...

দেহ শক্তিমান না হলে মনে জোর থাকে না। বাংলার ছেলেমেয়েদের শক্তি-চর্চায় উৎসাহ যোগাবার জন্য সরলা দেবীচৌধুরাণী বীরাষ্টমী ব্রতের প্রবর্তন করলেন। শারদীয়া মহাষ্টমীর দিনে বিরাট ধূমধাম করে লাঠি খেলা, তলোয়ার খেলা ও দৈহিক কসরৎ দেখানোর ব্যবস্থা হোল। দেশের সর্বত্র ব্যায়াম-চর্চার সাড়া পড়ে গেল, চারদিকে বহু ব্যায়াম-সমিতি গড়ে উঠলো।

কয়েকখানি কাগজের উপর এবার সরকারের নজর পড়লো,—এরা বেপরোয়া যত স্পষ্ট কথা লেখে—অন্যায়কে অন্যায় বলে লোককে দেখিয়ে দেয়। এদের মুখ আগে বন্ধ করা দরকার। প্রথমেই নালিশ হোল 'যুগান্তরের' সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের নামে। রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁকে এক বছর জেল খাটতে হোল।

তারপর ধরা পড়লেন 'সন্ধ্যার' সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। উপাধ্যায় সন্ন্যাসী মানুষ, বললেন—'দেশকে স্বাধীন করার জন্য আমি সামান্য যা করেছি তা বিধাতারই নির্দেশ, সেজন্য বিদেশী গবর্মেণ্টের কাছে আমি কোন জবাবদিহি করবো না।' মামলার ব্যাপার তিনি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলেন না, বললেন—'আমি সন্ন্যাসী মানুষ, ইংরেজের সাধ্য নেই যে আমায় জেলে দেয়!' হোলও তাই, বিচার শেষ হবার আগেই হাজতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন, অন্ত্রে অস্ত্রোপচার করতে হোল, জেল হাসপাতালেই তিনি মারা গেলেন।

তারপর উঠলো 'বন্দেমাতরমের' অরবিন্দ ঘোষের মামলা। বিচারে অভিযোগ টিকলো না, অরবিন্দ ঘোষ মুক্তি পেলেন। কিন্তু এই মোকদ্দমায়

হাকিম সাক্ষ্য দিতে ডাকলেন বিপিনচন্দ্র পালকে। বিপিনবাবু সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করলেন। হাকিমের আদেশ না মানার জন্য বিপিনবাবুর ছ'মাসের জেল হোল। বিপিনবাবুর বিচারের দিন আদালতে ভীড় হয়েছিল খুব। সেই ভীড়ের মাঝে পুলিশের সঙ্গে জনতার মারামারি হয়ে গেল। একজন সার্জেন্ট ভীড়ের মধ্যে কয়েক জনকে ঘুসি মারে। একটি ঘুসি এসে লাগে সুশীল সেন নামে বছর পনেরোর এক কিশোর ছেলের গায়ে। সে তখনই সুদে-আসলে আরেকটি ঘুসি সার্জেন্টকে ফিরিয়ে দিল। পুলিশকে মার! তখনই সুশীলকে পাকড়াও করে হাকিমের সামনে হাজির করা হোল, হাকিমও তৎক্ষণাৎ আদেশ দিলেন—পনেরো ঘা বেত লাগাও! সুশীলের পিঠে পনেরো ঘা বেত পড়লো, রক্তিম কালসিটে ফুটে উঠলো, কিন্তু মুখের হাসি মিলালো না।

এই মামলাগুলির বিচার করেন কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড। উপরওলারা তাঁর উপর খুসী হয়ে তাঁর পদোন্নতি করে দিলেন, মজঃফরপুরের দায়রা জজ হয়ে তিনি চলে গেলেন। তিনি বাংলাদেশ ছাড়লেন বটে, কিন্তু বাঙালীরা তাঁকে ছাড়লো না। দুটি ছেলে মজঃফরপুরে কিংসফোর্ডের গাড়ীর মধ্যে বোমা ছুড়লো। কিন্তু গাড়ীতে কিংসফোর্ড ছিলেন না। প্রিংলি কেনেডি নামে এক ইংরেজ ব্যারিস্টারের স্ত্রী ও মেয়ে বোমাহত হলেন। ছেলে দুইটি ধরা পড়ে গেল, একজনের হোল ফাঁসী, আরেকজন করলো আত্মহত্যা।

এতে বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে উৎসাহ কিছু কমলো না। ছোটলাটের উপর দু'বার বোমা ফেলা হোল। বড়লাট লর্ড মিণ্টোর উপরেও বোমা পড়লো। মানিকতলায় এক গুপ্ত বোমার কারখানা তৈরী হোল।

মাদ্রাজ, বোম্বাই ও মহারাষ্ট্রেও এই বিপ্লবের ঢেউ এসে লাগলো। পাঞ্জাবের লাজপৎ রায় নির্বাসিত হলেন, সর্দার অজিত সিংহের জেল হোল। মাদ্রাজের চিদাম্বরম্ পিলে ও সুব্রহ্মণ্য আয়ার দল গড়তে গিয়ে ধরা পড়লেন। মহারাষ্ট্রের গণেশ দামোদর সাভারকর কবিতা লিখে নির্বাসিত

হলেন, তাঁর দলের ছেলেরা নাসিকের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জ্যাক্‌সন্‌কে হত্যা করলো। 'কেশরী' কাগজে বোমারুদেরকে সমর্থন করে মন্তব্য লেখার জন্য তিলকের ছ'বছর জেল ও হাজার টাকা জরিমানা হোল।

বাংলায় বোমারুরা ধরা পড়লো, কারুর ফাঁসী হোল, কারুর-বা হোল দ্বীপান্তর। গবর্মেণ্ট সমস্ত ক্লাব ও সমিতি বন্ধ করে দিল। সব জায়গায় পিটুনি পুলিশ বসিয়ে জরিমানা আদায় করা হোল। মুকুন্দ দাস, ভবরঞ্জন মজুমদার, অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, সুবোধ মল্লিক, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, সতীশ চাটুজ্যে, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, পুলিন-বিহারী দাস, ভূপেশ নাগ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কর্মীদেরকে জেলে দেওয়া হোল।

কিন্তু এতো করেও বাঙালীকে আয়ত্তে আনা গেল না। গুপ্ত সমিতি-গুলি রীতিমত কাজ করে চললো। ডাকাতি করে তারা টাকা জোগাড় করতে লাগলো সমিতি চালাবার জন্য। হাওড়া ও ঢাকায় দুটি ষড়যন্ত্র মামলা ধরা পড়লো, কঠোর সাজাও হোল।

কিন্তু শেষে গবর্মেণ্টকে মাথা নোয়াতে হোল। ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ ভারতে এসে দিল্লীতে দরবার করলেন, সেখানে বঙ্গ-ভঙ্গ নাকচ করে সমস্ত বাংলাদেশ আবার এক করে দিলেন। বাঙালীর জয় হোল।



বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন যেমন সুরু হয় বাংলাদেশ নিয়ে, অসহযোগ-আন্দোলন তেমনি সুরু হয় পাঞ্জাব নিয়ে।

ইংরেজরা বলেছিল, যুদ্ধের পর ভারতবাসীকে তারা অনেক সুযোগ-সুবিধা দেবে, কিন্তু যুদ্ধের পরে তাদের দিক থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। ভারতীয়েরা বড়ই ক্ষুণ্ণ হোল। তার উপর গবর্মেণ্ট রাউলাট আইন জারী করলো। এই আইনের জোরে পুলিশ মনে করলেই যে কোন লোককে বিচার না করেই জেলে দিতে পারবে। এই আইনে প্রথমেই গ্রেপ্তার হলেন পাঞ্জাবের দু'জন নেতা—ডাক্তার সত্যপাল ও ডাক্তার কিচ্‌লু। অনেক পাঞ্জাবী তখন লড়াই থেকে ফিরেছে, তাদের মেজাজ তখনও ঠাণ্ডা হয়নি। তারাও সরকারী আপিসের উপর চড়াও হোল, কয়েকখানি বাড়ী ও ন্যাশন্যাল ব্যাংক পুড়িয়ে দিল। পাঁচজন ইংরেজ নিহত হোল।

পুলিশ দু'বার গুলি চালালো, সভা-সমিতি বন্ধ করে দিল।

পরদিনই হিন্দুদের নববর্ষ উৎসব (১৩ই এপ্রিল, ১৯১৯)। অমৃতসহরে পাঞ্জাবীরা এক সভা করলো। ছোট্ট বাগান জালিয়ানওয়ালা-বাগে প্রায় কুড়ি হাজার ছেলেমেয়ে সমবেত হোল। সভা সুরু হয়েছে। হঠাৎ কোথা

থেকে পঞ্চাশ জন গোরা আর শ'খানেক ভারতীয় সৈন্য এসে বাগের ফটকের সামনে দাঁড়ালো। সেনাপতির হুকুম হোল—গুলি চালাও!

ভারতীয় সৈনিকেরা ছিল সামনে, তাদেরকেই গুলি চালাতে হোল। তাদের পিছনে গোরাদের মোতায়েন করে রাখা হোল। যদি ভারতীয় সৈনিকেরা নিরস্ত্র দেশবাসীর উপর গুলি চালাতে অস্বীকার করে, তাহলে পিছন থেকে গোরারা তাদেরকে গুলি করে মারবে।

১৬০০ রাউণ্ড গুলি চললো। বাগ থেকে বাইরে যাবার আর কোন পথ ছিল না। যারা ওই ফটক দিয়েই কোন রকমে বেরিয়ে যাবে ভাবলো, তারাই গুলি খেলে। মরলো প্রায় হাজার খানেক, জখম হোল প্রায় দেড় হাজার। আর যারা মরার মত পড়ে রইল তারাই বেঁচে গেল সে-যাত্রা।

এতোগুলি নিরীহ লোককে খুন করার জন্য দায়ী ছিল সেদিনকার সেই সৈন্যদলের নায়ক জেনারেল ডায়ার। এজন্য ইংরেজরা তাকে কোন দোষ দিল না। পাঞ্জাবের লাট সাহেব তো খবর শুনে ভারী খুসী হলেন, প্রশংসা করে বললেন—ঠিক করেছ!

জেনারেল ডায়ার বললো—আরো গুলি চালাবার ইচ্ছা ছিল, আরো গুলি চালাতাম, কিন্তু কার্তুজ ফুরিয়ে গেল যে!

পরদিনই লাটসাহেব সামরিক-আইন জারী করলেন। লাহোর, কানপুর, শেখপুর, অমৃতশহর, গুজরাণওয়ালা প্রভৃতি শহরে জাঁদরেল সেনাপতিদের মোতায়েন করা হোল—কর্ণেল জনসন, কর্ণেল ওব্রায়েন, বসোয়ার্থ স্মিথ, মেজর কার্বি, লেফ্‌টেন্যাণ্ট ডোকার, ক্যাপ্‌টেন ডোভ্‌টোন, এমনি আরো কত। সৈনিকেরা নানা জায়গায় নানা অত্যাচার সুরু করে দিল: শহরের কোন-কোন পথ দিয়ে যেতে হ'লে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হবে,...সামান্য কারণে পথের চৌমাথায় কাঠের টিকটিকিতে বেঁধে নাগরিকদের বেত মারা হোল,...মেয়েদের নগ্ন করে পথ দিয়ে মার্চ করিয়ে নিয়ে যাওয়া হোল,...যত ছাত্র ও শিক্ষকদেরকে গ্রেপ্তার করে জেলে ভর্তি করা হোল।...নাগরিকদের জীবন দুঃসহ হয়ে উঠলো।

পাঞ্জাবের সমস্ত খবরের কাগজ বন্ধ করে দেওয়া হোল, বাইরে যেন কোন খবর না যায়। তবু কেমন করে জানিনা, কিছু খবর বাইরে এসে পড়লো। দীনবন্ধু এণ্ডরুজ পাঞ্জাবে যেতে গিয়ে পথে গ্রেপ্তার হলেন। রবীন্দ্রনাথ বড়লাটের কাছে চিঠি লিখলেন—কোন সভ্য জাত যে এতদূর নিষ্ঠুর হতে পারে, ইতিহাসে কোথাও তা পড়িনি।...আমার দেশবাসী যে অমানুষিক অত্যাচার সইছে, তারপর বিদেশীর দেওয়া এই সম্মান (স্যার উপাধি) শুধু লজ্জা জাগায়। আমি সব কিছু ছেড়ে সামান্য একজন মানুষ হিসাবে আমার অত্যাচারিত অসহায় দেশবাসীর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে চাই, সেই জন্যই দুঃখের সঙ্গে সম্রাটের দেওয়া এই খেতাব আমি ফেরত দিচ্ছি, আপনি আমাকে এই 'স্যার' উপাধির সম্মান থেকে মুক্তি দিন।

গান্ধীজীও তাঁর কাইজার-ই-হিন্দ্ পদক ফেরৎ দিলেন।

সারা ভারতে অসন্তোষ দেখা দিল, গবর্মেণ্ট তখনকার মত ব্যাপারটিকে চাপা দেবার জন্য একটা কমিটি করলেন,—হাণ্টার সাহেবের কমিটি। কমিটির কাজ হোল সব ব্যাপারটির খোঁজ-খবর নিয়ে একটা বিবরণ প্রকাশ করা,—দেশের লোককে বোঝানো যে ব্যাপারটা যত বড় বলে তারা মনে করছে, তত ভয়াবহ কিছু নয়। কংগ্রেস একজন এটর্নিকে নিযুক্ত করলো, কমিটির এই কাজকর্মের তদ্বির করার জন্য। তিনি সাহেব, কিন্তু হলে কি হয়, কুড়ি জন গোরা সৈন্য রাত্রে তাঁর বাড়ীতে চড়াও হয়ে তাঁকে মার-ধর করে। শেষে এই সরকারী কমিটির সঙ্গে কংগ্রেসের মতে মিললো না, কংগ্রেসীরা নিজেদের এক কমিটি করলো। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, পণ্ডিত মতিলাল, পণ্ডিত মদনমোহন, পণ্ডিত জওহরলাল, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি নেতারা পাঞ্জাবে গিয়ে খোঁজখবর নিতে সুরু করলেন। তাঁদের খবর শুনে এদেশের লোকেরা বিশ্বাস করতে পারলো না যে, ইংরেজের মত একটা সভ্য জাত ভারতবাসীর সঙ্গে এমন বর্বর ব্যবহার করতে পারে।

ইতিমধ্যে পাঞ্জাবের লাটসাহেব স্যার মাইকেল ও সেনাপতি ডায়ার

বিলাতে চলে গেলেন। পাঞ্জাবকে শায়েস্তা করার জন্য বিলাতের লোকেরা হাউস-অফ-লর্ডস-এ তাদের খুব প্রশংসা করলো। ইংরেজ মহিলারা প্রায় তিন লাখ টাকা (২৬০০০ পাউণ্ড) চাঁদা তুলে সেনাপতি ডায়ারকে বীরত্বের পুরস্কার দিল।

এই খবর চাপা রইল না। বিক্ষুব্ধ জনগণ ইংরাজ শাসকদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলো। গান্ধীজী কর্ম-সূচী তৈরী করলেনঃ সরকারী খেতাব বর্জন করতে হবে, সরকারী ইস্কুল-কলেজ বর্জন করতে হবে, সরকারী আদালত বর্জন করতে হবে, ব্যবস্থা-পরিষদ বর্জন করতে হবে। বিদেশী জিনিষ বয়কট করতে হবে, জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সালিশী আদালত প্রতিষ্ঠা করতে হবে, ঘরে ঘরে চরকা কাটার প্রচলন করতে হবে।...

গান্ধীজী সারা ভারত ভ্রমণ করলেন, বললেন—হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়া ভুলতে হবে, ঘরে ঘরে চরকা চালাতে হবে, অস্পৃশ্যতা বর্জন করতে হবে, সব রকম নেশা করা ছাড়তে হবে,—তাহলেই এক বছরের মধ্যে আমরা স্বরাজ পাব।

ভারতব্যাপী আন্দোলন স্নুরু হয়ে গেল। গাঁয়ে গাঁয়ে কংগ্রেসের কর্মীরা ছড়িয়ে পড়লো। বিশ লাখ চরকা ঘুরতে লাগলো গাঁয়ের ঘরে ঘরে।

শহরের ছেলেরাও চুপ করে বসে রইল না, ইস্কুল-কলেজ ছেড়ে স্নুরু করলো চরকা কাটতে, খদ্দর ফিরি করতে, বিলিতী কাপড় পোড়াতে, মদের দোকানে পিকেটিং করতে।

কুলি-মজুরদের মাঝেও কংগ্রেসের কথা গিয়ে পৌছালো। তারাও নিজেদের অধিকার দাবী করলো। আসামের চা-বাগানে মজুরদের অনেক খাটতে হোত, তেমন মাইনে পেত না, খেতে পেত না। তারা সবাই মিলে ঠিক করলে—কাজ আর তারা করবে না, দেশে ফিরে যাবে। তাদেরকে ট্রেনে উঠতে দেওয়া হোল না, হাঁটা-পথে তারা চাঁদপুরে এলো। সেখানে পুলিশ তাদের উপর গুলি চালালো, অথচ তারা কোন দোষ

করেনি। এই অন্যায় সইতে না পেরে রেল ও স্টীমারের সমস্ত কর্মচারীরা ব্যাপক ভাবে ধর্মঘট করলো। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন হাজার হাজার টাকা ঋণ করে এই ধর্মঘটীদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করলেন।

নভেম্বর মাসে যুবরাজ (অষ্টম এডোয়ার্ড) ভারতে এলেন। যেদিন তিনি জাহাজ থেকে নামলেন, সেদিন সারা দেশে হরতাল পালন করা হোল। যেদিন যুবরাজ কলিকাতায় এলেন (২১শে ডিসেম্বর), সেদিন শহরে আলো অবধি জ্বললো না।

পুলিশ নেতাদের ধরতে স্থুরু করলো। সর্বত্র ১৪৪ ধারা জারী হোল—পাঁচজনের বেশী লোক কোথাও জমা হওয়া চলবে না। কিন্তু সে কথা শোনার মত লোক তখন কেউ ছিল না। অনেক জায়গায় পুলিশের সঙ্গে জনতার রীতিমত হাঙ্গামাও ঘটে গেল।

শুধু বাংলাদেশেই ষোল হাজার কংগ্রেসীর জেল হোল। বাসন্তী দেবী, ঊর্মিলা দেবী, স্থনীতি দেবী প্রভৃতি মেয়েরাও বাদ গেলেন না। বাকী রইলেন শুধু গান্ধীজী। কিন্তু গান্ধীজী তখন কংগ্রেসের ডিক্‌টেটর, সারা ভারতের জনগণের মুকুটহীন রাজা। তাঁকে ধরতে গবর্মেণ্ট সাহস করলো না।

বড়লাট বললেন—একটা গোলটেবিল বৈঠক বসিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলা হোক।

গান্ধীজী বললেন—যাদেরকে ধরা হয়েছে তাদেরকে আগে ছেড়ে দিতে হবে, তারপর অন্য কথা।

মতে মিললো না, গান্ধীজী আইন অমান্য করার জন্য তৈরী হলেন। কোন কিছু লুকিয়ে করা তাঁর নীতি নয়, বড়লাটের কাছে তিনি চিঠি লিখলেন—বড়দৌলি তালুকে সাতদিন পরে আমি আইন অমান্য আন্দোলন স্থুরু করবো।

যেসব কংগ্রেসীরা তখনও জেলের বাইরে ছিলেন তাঁরাও তৈরী হতে লাগলেন।

কিন্তু তার আগেই চাকা অন্যদিকে ঘুরে গেল। গোরক্ষপুর জেলার

চৌরীচৌরা থানায় এক বীভৎস হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল। কংগ্রেসের মিছিল যাচ্ছিল পথ দিয়ে, পুলিশ আপত্তি জানালো। জনতা সে আপত্তি শুনলো না। পুলিশ ও জনতায় সংঘর্ষ বেধে গেল। শেষে লোকগুলি ক্ষেপে গেল, দারোগা ও একুশ জন পুলিশকে থানার মধ্যে বন্ধ করে থানায় আগুন লাগিয়ে দিল। বাইশ জন মানুষ জীবন্ত পুড়ে মরলো। এই খবর শুনে গান্ধীজী মনে বড় আঘাত পেলেন, তিনি অহিংসায় বিশ্বাসী, বললেন—দেশ এখনও তৈরী হয়নি, আমি আন্দোলন বন্ধ করার নির্দেশ দিলাম।

কংগ্রেস-কর্মীরা বিমূঢ় হয়ে পড়লো। পণ্ডিত মতিলাল, লাজপৎ রায়, হরদয়াল নাগ, ডাক্তার মুঞ্জে, পণ্ডিত জওহরলাল প্রভৃতি গান্ধীজীর এই দুর্বলতা দেখে ক্ষুণ্ণ হলেন। মহাত্মাজীর জনপ্রিয়তা খানিকটা কমে গেল। গবর্মেণ্ট দেখলো—এই সুযোগ, গান্ধীজীকে এবার তারা ধরলো। 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' কাগজে কয়েকটি লেখার জন্য তাঁর ছ' বছর জেল হোল।

অসহযোগ আন্দোলনের উপর যবনিকা পড়লো।

———



আইন অমান্য আন্দোলন

১৯৩০ খৃস্টাব্দে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করবে বলে কংগ্রেস ঠিক করলো। ২৬শে জানুয়ারী সকাল বেলা ভারতের সর্বত্র জনগণ প্রতিজ্ঞা করলো অহিংস উপায়ে স্বরাজ লাভের জন্য প্রত্যেকে চেষ্টা করবে।

গান্ধীজী হলেন সর্বাধিনায়ক, বড়লাটকে তিনি লিখলেন—বন্ধু, সমস্ত দেশটাই একটা জেলখানা। আইন বলে এদেশে যা চলে, তা বৃটিশ শাসকদের ইচ্ছা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই শান্তি ও শৃঙ্খলা ভাঙা আমি একটা পুণ্য কাজ বলে মনে করি।

সবরমতী আশ্রম থেকে গান্ধীজী বেরিয়ে পড়লেন লবণ-আইন ভাঙতে। সঙ্গে উনআশী জন আশ্রমিক,—কাঁধে একটি করে ঝোলা, হাতে এক একটি লাঠি।

দীর্ঘ পথ। সবরমতী আশ্রম থেকে দণ্ডীর সমুদ্র-তীর দু'শো মাইল দূর। অর্ধনগ্ন সন্ন্যাসী সেই পথ ধরে এগিয়ে চললেন। দু'পাশের গাঁয়ের কত মানুষ ফুল ও নারিকেল হাতে নিয়ে পথের পাশে এসে দাঁড়ালো।

কত জন চললো তাঁর পিছনে। চারিপাশের মানুষ সাড়া তুললো—গান্ধীজীর জয়!

দীর্ঘ পথ, বাপুজী এগিয়ে চলেন। পিছনে গাঁয়ের পর গাঁ দিগন্তে হারিয়ে যায়ঃ আস্‌লি, বরেজা ও নবগ্রাম, বসনা, মাতার ও নদিয়াদ, বোরাইয়াড়ি, দাভন, আনন্দ ও বোরসাদ। কত সরকারী কর্মচারী গান্ধীজীর বাণী শুনে চাকুরী ছেড়ে দিল, কত পুলিশ পাগড়ী ও চাপরাস ফেলে দিয়ে পথে এসে নামলো।

পঁচিশ দিন পরে সাগর-সৈকতে এসে গান্ধীজী দাঁড়ালেন; বললেন—বৃটিশ-শাসন ভারতভূমির সব দিক থেকে সর্বনাশ করেছে—আমাদের নীতি, আমাদের সম্পদ, আমাদের কৃষ্টি, আমাদের ধার্মিকতা—ধ্বংস করতে কিছুই আর বাকী রাখেনি। এই শাসনকে আমি একটি অভিশাপ বলে মনে করি, সেইজন্যই এই শাসন-পদ্ধতিকে ধ্বংস করবো বলেই আমি পথে বেরিয়েছি, এই অভিশাপকে মুছে ফেলাই আমার ধর্ম।

গান্ধীজী নিজের হাতে সাগরের জল তুলে এনে লবণ তৈরী করলেন। তার পর থেকেই দেশের সর্বত্র নুন তৈরী করা সুরু হোল।

লবণ তৈরী করা মানে আইন অমান্য করা। এই লবণ-আইনের একটা ইতিহাস আছে। আগেকার দিনে ইংরেজরা যখন প্রথম এদেশে রাজ্যের পত্তন করলো, তখন এদেশ থেকে জিনিষ যেত বিলাতের বাজারে বিক্রী হবার জন্য। বিলাত থেকে খুব কম জিনিষই আসতো এদেশে। বেশী যায়, কম আসে। কাজেই অনেক সময়ে খালি জাহাজ বিলাত থেকে ফিরতো। কিন্তু খালি জাহাজ চলে না। অথচ নিয়ে যাবার মত কিছুই নেই। কাজেই কেবল মাটি বোঝাই করে জাহাজ আনা হোত। সেই মাটি এখানকার একটি খাল ভরাট করার কাজে লাগতো। গঙ্গা থেকে কালীঘাটের মন্দির অবধি একটি খাল ছিল, সেইটিই ভরাট হয়ে চৌরঙ্গী রোড তৈরী হোল। কিন্তু এইভাবে মাটি আনা তো আর লাভের ব্যবসা নয়, এমন কিছু আনতে হবে যা এদেশে বিক্রী করা চলে। মাটির বদলে লবণ আনার ব্যবস্থা হলো। বিলিতী নুন সস্তায় বেচার জন্য এদেশী

নুনের উপর কর বসানো হলো। তাতে বিলিতী নুনের চেয়ে দেশী নুনের দাম বেড়ে গেল। সস্তা হওয়ায় বিলিতী লবণই বাজারে চলতে লাগলো।—অন্ন, বস্ত্র, জলের মত নুন মানুষের প্রতিদিনকার প্রয়োজন, এই গরীবের দেশে প্রতিদিনকার আহার্যের উপর এইভাবে কর বসানোর প্রতিবাদে গান্ধীজী এই লবণ-আইনই সবার আগে অমান্য করতে সুরু করলেন।

গান্ধীজী ধরসনা ও চরসদার লবণ-গোলা আক্রমণ করার জন্য উদ্যোগ করলেন। কিন্তু তার আগে তাঁকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলো। কাজ কিন্তু বন্ধ রইল না, গান্ধীজীর নেতৃত্ব নিলেন তেষট্টি বছরের বুড়ো আব্বাস তায়েবজী, তারপর সরোজিনী নাইডু। দুর্বার বেগে স্বেচ্ছাসেবকেরা লবণ-গোলার দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। কত জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলো, লাঠি চালালো কত জনের উপর। তারা মার খেল কিন্তু মারলো না। বিলিতী কাগজের রিপোর্টাররা এই দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গেল।

ওয়েব-মিলার লিখলেন—ধরসনার সামনে দাঁড়িয়ে লবণগোলা আক্রমণের দৃশ্য দেখছি, মাঝে মাঝে তা এতই বেদনাদায়ক হয়ে উঠছে যে দেখতে পারছি না, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি। সেচ্ছাসেবকেরা পুলিশের হাতে মার খাচ্ছে, কিন্তু এতটুকু হিংসা প্রকাশ করছে না। গান্ধীজীর অহিংসা-নীতিতে এদের বিশ্বাস দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি।

জর্জ শ্লোকাম্ব লিখলেন—ওয়াদালার চারিপাশ ঘিরে যে পাহাড়ের সারি আছে, তারই একটির উপর থেকে আমি দেখছিলাম। আমার চারিপাশে আরো অনেক ভারতীয় দাঁড়িয়েছিলেন, তাদের মুখের পানে তাকাতে আমার লজ্জা করছিল। আমার দেশের লোকেরা শাসনের নামে যে ব্যাপার চালাচ্ছে, তা দেখে আমিও যে ইংরাজ এই কথা ভেবে আমার মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছিল।

আন্দোলন সারা ভারতের বুকে ছড়িয়ে পড়লো। মেদিনীপুর, মহিষবাথান এবং অন্যান্য অনেক স্থানে নুন তৈরী সুরু হোল। বিলিতী

কাপড় আর মদের দোকানে সুরু হোল ধরনা দেওয়া। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার চৌকিদারী ট্যাক্স্ দেওয়া বন্ধ হোল। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, অন্ধ্র, তামিলনাদ ও পাঞ্জাবের প্রজারা ভূমিকর দিল না। বেরারে বন-আইন না মেনে প্রজারা গাছ কেটে আনতে লাগলো। সমস্ত কংগ্রেসী নেতাদের পুলিশ গ্রেপ্তার করলো। পুরুষের দল জেলে ভর্তি হোল, মেয়েরা এবার বাড়ীর বাইরে এসে দাঁড়ালো। মেয়েদের উপরেও পুলিশ লাঠি চালাতে ছাড়লো না। বহু মহিলা আহত হলেন, জেল খাটতে হোল অনেককেই। পণ্ডিত জওহরলালের মা, বর্ষীয়সী স্বরূপরাণী নেহেরু এই সময় পুলিশের হাতে মার খান।

যত দিন যায় আন্দোলন তত ব্যাপক হয়ে উঠে। বড়লাট তেরো দফা নতুন আইন করলেন। আন্দোলন সম্পর্কে সমস্ত খবর কাগজে বেরুনো বন্ধ করে দিলেন। ১৩১ খানি কাগজ থেকে দু'লাখ চল্লিশ হাজার টাকা জামিন আদায় করা হোল। পুলিশ সমস্ত কংগ্রেস-আপিসে তালা লাগিয়ে দিল।

কিন্তু শেষ অবধি গান্ধীজীর প্রভাব সৈন্যদের উপরেও ছড়িয়ে পড়লো। সীমান্ত প্রদেশের নিরস্ত্র পাঠানদের এক সভা বসেছিল, গাড়োয়ালি সৈন্যদের হুকুম দেওয়া হোল গুলি চালিয়ে সেই সভা ভেঙ্গে দেবার জন্য, তারা সে হুকুম মানলো না। আদালতের বিচারে তাদের এক একজনের চৌদ্দ বছর করে জেল হোল।

বছরখানেকের মধ্যে এই আন্দোলনে এক লাখ লোককে জেল খাটতে হয় ও জরিমানা দিতে হয়। পুলিশের গুলিতে মারা যায় ১০১ জন, আহত হয় ৪২৭ জন। আর লাঠি খেয়ে কত জনের যে মাথা ফাটে তার হিসাব নেই।

ব্যাপারটিকে মিটিয়ে ফেলার জন্য বড়লাটের সঙ্গে কংগ্রেসী নেতাদের কথাবার্তা সুরু হোল। নেতারা বললেন—আমাদের দেশের শাসন-ক্ষমতা আমাদের হাতেই ছেড়ে দিতে হবে।

বিলাতে প্রথম গোল-টেবিল-বৈঠক বসলো (১২ই নভেম্বর, ১৯৩০)। ন'সপ্তাহ ধরে এদেশ সম্পর্কে নানা আলোচনা চললো। এদেশ থেকে

যাঁরা গেলেন তাঁরা কেউ জনসাধারণের লোক নন—লাটসাহেবের যাঁকে পছন্দ হয়েছে পাঠিয়েছেন। এইসব মানুষগুলির কাছ থেকে সত্যিকারের ভালো কাজ কিছু পাওয়া যাবে না দেখে দেশে আবার একটি আন্দোলন সুরু হবার উদ্যোগ হচ্ছে, এমন সময় সরকার গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতাদেরকে ছেড়ে দিলেন। গান্ধীজীর সঙ্গে লাটসাহেবের কথা চললো পনেরো দিন ধরে, শেষে দু'জনের মধ্যে এক সন্ধি হোল—বড়লাট তাঁর দমন-নীতি বন্ধ করবেন, আর কংগ্রেস তার আইন-অমান্য স্থগিত রাখবে।

তখন লাহোর যড়যন্ত্র মামলা চলছিল। সণ্ডার্স সাহেবকে খুন করার অভিযোগে তিনজন আসামীর ফাঁসী হয়ে গেল—ভগৎ সিং, রাজগুরু, শুকদেব। এই ব্যাপারে দেশব্যাপী আবার হৈ চৈ সুরু হোল। করাচী ও কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে কতজন লাঠি খেল, পুলিশ আবার কতজনকে গ্রেপ্তার করলো।

ওদিকে কংগ্রেসীদের খুসি করার জন্য বিলাতে দ্বিতীয় গোল-টেবিল বৈঠক বসলো, এবার গান্ধীজী, সরোজিনী নাইডু ও মালব্যজী সেই বৈঠকে যোগ দিলেন। এগারো সপ্তাহ ধরে আলোচনা হোল, কিন্তু শেষে গান্ধীজীকে বিষণ্ণ মনে নিরাশ হয়েই ফিরতে হোল।

কোন মিটমাট হোল না দেখে দেশের মাঝে আবার নতুন করে আইন-অমান্যের সাড়া পড়ে গেল। যুক্তপ্রদেশ, বাংলা ও সীমান্তে ধরপাকড় সুরু হোল, অর্ডিনান্স জারী হোল, গুলি চললো, লাঠি চললো, পাইকারী জরিমানা বসলো। গান্ধীজী ও সমস্ত কংগ্রেসী নেতারা গ্রেপ্তার হলেন। কিন্তু আন্দোলনের রেশ তাতে বিশেষ কিছু কমলো না।

ইতিমধ্যে বিলাতের প্রধান মন্ত্রী ম্যাক্‌ডোনাল্ড সাহেব ভারতের হিন্দুদের দু'ভাগ করে দেবার ব্যবস্থা করলেন—উঁচু-জাত আর ছোট-জাত। জেলের ভিতর থেকেই গান্ধীজী এতে আপত্তি জানালেন, সুরু করলেন একুশ দিন উপবাস। গবর্মেণ্ট গান্ধীজীকে ছেড়ে দিল। জেল থেকে বেরিয়ে এসে গান্ধীজী কংগ্রেসকে ছ'সপ্তাহের জন্য আইন-অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার নির্দেশ দিলেন।

কংগ্রেসী নেতারা এই নীতি মেনে নিতে পারলেন না, পুণায় তিলক-মন্দিরে নেতাদের এক বৈঠক বসলো, তাতে ঠিক হোল গণ-আন্দোলনের বদলে ব্যক্তিগত আন্দোলন চালানো হবে। গান্ধীজী চৌত্রিশ জন আশ্রমবাসাকে নিয়ে আন্দোলন সুরু করলেন। গান্ধীজীর এক বছর জেল হোল। সারা দেশে আবার ধরপাকড় সুরু হোল।

দিন বারো পর থেকেই গান্ধীজী আবার উপবাস সুরু করলেন। গবর্মেণ্ট তাঁকে ছেড়ে দিল। গান্ধীজী দশ মাস ধরে সারা ভারত পরিভ্রমণ করলেন হরিজনদের অবস্থার উন্নতি করার উদ্দেশ্যে।

ক'মাস পরে কংগ্রেসের বৈঠক বসলো, তাতে স্থির হলো যে এদেশে ইংরেজরা যেভাবে রাজকার্য চালাচ্ছে, তাতে আইন-অমান্য আন্দোলন এখনকার মত বন্ধ রেখে, দেশের জনসাধারণের মাঝে আরো ব্যাপকভাবে কংগ্রেসের কথা—স্বাধীনতার কথা—স্বরাজ্যের কথা প্রচার করা উচিত।

কংগ্রেস আন্দোলন বন্ধ করলো। গবর্মেণ্টও কংগ্রেসী রাজবন্দীদের ছেড়ে দিল, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলিও আর বে-আইনী রইল না।



ভারত ছাড়ো আন্দোলন

জগৎব্যাপী যুদ্ধে ইংরেজদের অবস্থা ক্রমশঃ জটিল হয়ে উঠলো। ফ্রান্স থেকে রুশিয়া অবধি সমস্ত য়ুরোপ জার্মানি দখল করেছে, মিশরের সীমান্তে এসে পড়েছে ইতালি, জাপান এসেছে ব্রহ্মদেশে—আর বুঝি রাজ্য রাখা যায় না। ইংলণ্ডের চার্চিল আর আমেরিকার রুজভেল্ট ছুনিয়ার লোককে বোঝাতে চাইলেন যে তাঁরা জগতের লোকের উপকারের জন্যই লড়াই চালাচ্ছেন, অতলান্ত মহাসাগরের বুকে এক জাহাজে বসে, ছু'জনে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করলেন—এই যুদ্ধের পর জগতের আইন-কানুন এমন করে তৈরী করতে হবে যে ছুনিয়ায় আর এমন যুদ্ধ না ঘটে—সব দেশকে স্বাধীন করা হবে, কারুর কোন অভাব রাখা হবে না, কারুর ধর্ম নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না, কারুর মতামত প্রকাশের কোন বাধা থাকবে না, ইত্যাদি…

ভারতবাসীরা জিজ্ঞাসা করলো—তাহলে আমাদেরকেও স্বাধীন করার প্রতিশ্রুতি দাও?

চার্চিল কি রুজভেল্ট সাহেব এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না। ভারতে বৃটিশ-বিদ্বেষ ব্যাপক হয়ে দেখা দিল, গান্ধীজী ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ করার

নির্দেশ দিলেনঃ এক একজন সত্যাগ্রহী একা একা পথ চলবে, পথিকদেরকে ডেকে বলবে—যুদ্ধে যোগ দিও না, এ যুদ্ধ আমাদের যুদ্ধ নয়, এ যুদ্ধ ইংরেজদের রাজ্যরক্ষার যুদ্ধ (সেপ্টেম্বর, ১৯৪০) !

এই আন্দোলন সুরু করলেন আচার্য বিনোবা ভাবে, এবং বছর খানেকের মধ্যে আড়াই হাজার কংগ্রেস-কর্মী গ্রেপ্তার হলেন।

বিলাত থেকে ক্রিপস্ সাহেব এলেন, বললেন—স্বরাজ দেবার কথা পরে, আগে আমাদের হয়ে লড়াই কর !

কংগ্রেসী নেতারা তার উত্তর দিলেন—বৃটিশ, ভারত ছাড়ো ! (৮-ই আগস্ট, ১৯৪২)

পরদিন সকালে সমস্ত কংগ্রেসকর্মীরা পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লেন। গোপনে সভা ডেকে তাঁরা সকলকে শুনিয়ে দিলেন—গান্ধীজী নির্দেশ দিয়েছেন, বৃটিশকে এদেশ থেকে তাড়াবার জন্য জীবন পণ করতে হবে,—করেঙ্গে বা মরেঙ্গে !

জনতা পথে বেরিয়ে পড়লো। টেলিগ্রাফের খুঁটি উপড়ে ফেললো, টেলিফোনের তার কেটে দিল, রেল-লাইন ভেঙে দিল, থানা দখল করলো, আদালত ও পোস্টাপিস লণ্ডভণ্ড করে দিল, রাস্তা ভেঙে খানা কেটে দিল, পুল ভেঙে দিল, বেতার-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে স্বদেশী খবর প্রচার করা সুরু হোল, অনেক জায়গায় জাতীয় সরকার গঠিত হোল, দেখতে দেখতে ভারতের সর্বত্র ইংরেজ সরকার অচল হয়ে গেল।

তারপর এলো মিলিটারী, এলো উড়োজাহাজ। বোমা পড়লো, গুলি চললো। কত কর্মী বীরের মত বন্দুকের সামনে বুক পেতে দিলেন, আবার কত নিরীহ লোকও মরলো। পুলিশ কত লোকের বাড়ী পুড়িয়ে দিল, কতজনের সর্বস্ব লুঠ করলো, কারণে-অকারণে কতজন ঝুললেন ফাঁসী-কাঠে।

মেদিনীপুরের 'বিদ্যুৎবাহিনী' তমলুক থানা আক্রমণ করলো, চারিপাশ থেকে সাড়া তুললো—বন্দেমাতরম্। পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়লো তাদের উপর, কিন্তু লাঠি চালিয়ে আর কত হটাবে, পিছনে তৈরী ছিল মিলিটারী,

তারা গুলি চালালো। রামচন্দ্র বেরা ছিলেন সবার আগে, গুলি খেয়ে পড়ে গেলেন, একজন পুলিশ তাঁকে টেনে আনলো থানার ভিতরে। ঝর-ঝর করে রক্ত ঝরছে, বেরা অচেতন হয়ে পড়লেন। তাঁর রক্তপাত কেউ বন্ধ করলো না। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে হঠাৎ তিনি চোখ মেললেন—সামনে তখনও ভীড়, তখনও গুলি চলছে। রামচন্দ্র গড়িয়ে গড়িয়ে দেহটাকে টেনে আনলেন দরজার বাহিরে, কোন রকমে মাথাটা খানিক তুলে চীৎকার করে উঠলেন—আমি এখান অবধি এসেছি, তোমরা এগিয়ে এসো, থানা এখনই দখল হয়ে যাবে!

জনতা বিপুল উত্তেজনায় এগিয়ে এলো, সঙ্গে সঙ্গে আরেক ঝাঁক গুলি এসে তাদের কয়েক জনকে ধরাশায়ী করলো।

ওই দলে ছিল তেরো বছরের একটি ছেলে লক্ষ্মীনারায়ণ দাস। এরই মাঝে কোন এক সময় এগিয়ে এসে সে এক সৈনিকের হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নিল। বাকী সৈনিকগুলো তাকে ঘেরাও করে রীতিমত প্রহার দিতে সুরু করেছে, এমন সময় ৭৩ বছরের বুড়ী মাতঙ্গিনী হাজরা কংগ্রেসী নিশান হাতে নিয়ে এগিয়ে এলেন। বারেক সৈনিকেরা ইতস্ততঃ করলো, তারপরেই গুলি চালালো। কপাল ফুটো করে গুলি বেরিয়ে গেল। মাতঙ্গিনী পড়ে গেলেন। তখনও তাঁর হাতের নিশান উড়ছে। একজন সৈনিক নিশানটা লাথি মেরে ফেলে দিল। পরক্ষণেই গুলি খেয়ে সেখানে লুটিয়ে পড়লো তেরো বছরের ছেলে লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, চৌদ্দ বছরের ছেলে পুরীমাধব প্রামাণিক, নগেন্দ্রনাথ সামন্ত ও জীবনচন্দ্র বেরা।

দশ হাজার লোক সারারাত থানার বাইরে বসে রইল, পরদিন চারিপাশ থেকে আরো কতজন এলো। পঁচিশ হাজার লোক একসঙ্গে থানার উপর চড়াও হোল—কে কত গুলি চালাবে! থানার দারোগার বাড়ী অবধি তারা জ্বালিয়ে দিল।

বোলপুরে সাঁওতাল ও সৈনিকদের মধ্যে লড়াই বেধে গেল। রীতিমত তীর-ধনুক নিয়ে লড়াই চললো কয়েক ঘণ্টা।

কলিকাতায় গোপন রেডিও-স্টেশন খোলা হোল, ৪১·৬৮ মিটারে

রীতিমত খবর প্রচার হতে লাগলো—সারা ভারতের পুলিশ আর মিলিটারীদের জুলুম-কাহিনী।

তিন জন ক্যানেডিয়ান সৈনিক আসছিল পাটনার পথে। কিন্তু ওদিকে তখন লাইন উপড়ে ফেলা হয়েছে, ফতোয়া স্টেশনে এসে তাদের ট্রেন একেবারে থেমে গেল। একে লাল-মুখ তার উপর বন্দুক আছে। অনেক লোক জড়ো হোল বন্দুক তিনটি কেড়ে নেবার জন্য। জনতা কাছে আসতেই সাহেবরা গুলি করার ভয় দেখাল, বেপরোয়া যুবকের দল ঝাঁপিয়ে পড়লো তাদের উপর। বন্দুক তিনটি তো হস্তগত করলই, সাহেব তিনজনও মারা পড়লো নিজেদের দুর্ব্যবহারের জন্য। এই ব্যাপারে অনেক লোককে ধরে পুলিশ চালান দিল, সাত জনের ফাঁসীর হুকুম হোল। পরে গান্ধীজীর চেষ্টায় বড়লাট তাদের মৃত্যুদণ্ড মকুব করে দিলেন।

বিহারের সব জায়গাতেই তখন গুলি চলছে, জামসেদপুরেও একটা বিপর্যয় ঘটে গেল। বিরাট লোহার কারখানা বন্ধ হয়ে গেল কয়েক সপ্তাহের জন্য, লোকেরা কেউ কাজ করবে না, শুধু এক ধ্বনি—ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ। পথে পথে মিছিল, পথে পথে জনতা। পুলিশ এলো, দেশী মিলিটারী এলো; হুকুম হোল—গুলি চালাও। হাবিলদার ছিলেন ভারতীয়, তিনি বললেন—এরা তো কোন অন্যায় করেনি, শুধু শুধু এদেরকে মারবো কেন?

বটে! তখনই গোরা সৈন্য আনিয়ে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হোল, বিচারে দলের প্রত্যেকেরই জেল হয়ে গেল।

জনতা একদিন ক্ষিপ্ত হয়ে হাজারিবাগ জেল আক্রমণ করলো। গোলমাল·· চীৎকার···হাঙ্গামা···। তারই মাঝে জেলের ভিতর থেকে কয়েক জন নেতা পালিয়ে গেলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন—জয়প্রকাশ নারায়ণ, পণ্ডিত যোগেন্দ্র শুক্ল ও পণ্ডিত রামনন্দন মিশ্র।

উড়িষ্যায় মাল্‌কান্‌গুড়ি তালুকের হাটে লক্ষ্মণ নায়ক এক বক্তৃতা করেন, পুলিশ এসে তাঁকে পাকড়াও করলো। এক বিরাট জনতা লক্ষ্মণের পিছু

পিছু থানায় এলো। হট্ যাও! হট্ যাও!!—বলে হঠাৎ পুলিশ তাদের উপর বন্দুক আর লাঠি চালাতে সুরু করে দিল। অনেকের উপর বেয়োনেটও চার্জ করলো। লক্ষ্মণ নায়ক বেয়োনেটের খোঁচা খেয়ে পড়ে গেলেন, আর গুলি খেয়ে মরলো ছ'জন। জয়পুর জমিদারীর এক বনরক্ষক ছিল পুলিশের দলে। মদ খেয়ে সে টলছিল, চারিপাশের হুড়োহুড়ির মধ্যে সে কখন টলে পড়ে, মাথায় চোট লাগে, তাইতেই সে মারা যায়। পুলিশ লক্ষ্মণ নায়ককেই খুনী বলে দায়ী করে, বিচারে তাঁর ফাঁসী হোল। হাইকোর্টে আপীল করেও ফল হোল না।

পুলিশ যে শুধু গুলিই চালিয়েছিল তা নয়, জাজপুরে বোমারু-বিমান থেকে ফসফরাস বোমা ফেলা হয়। নন্দীপুর থানায় গৌরচন্দ্র বিষয়ী ও পিতাম্বর খিল্লুকে পায়ে দড়ি বেঁধে পুলিশ ঝুলিয়ে রাখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। জয়পুর থানার কর্তারা কমললোচন নাইকোকে বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে উত্তম-মধ্যম প্রহার দেয়। তারপর জামা-কাপড় কেড়ে নিয়ে থানা থেকে বের করে দেয়, রাত্রে ছ'মাইল পথ তাকে ন্যাংটা হয়ে বাড়ী ফিরতে হয়। পত্রপুট থানায় কংগ্রেসীদের ধরে এনে দারোগাবাবু এমন প্রহারের ব্যবস্থা করে যে, বারবার সেই রকম মার খাবার ভয়ে একজন কংগ্রেসী গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

তালচরের রাজ্যে প্রজারা রাজবাড়ী আক্রমণ করলো, রাজার কাছে তারা আবেদন করলো—'কষাণ ও মজুরের হাতে রাজ্য সমর্পণ করুন।' রাজা বিমান-বাহিনী ও পদাতিক 'বাহিনী নিয়ে তৈরী হয়েই ছিলেন। বুম্ বুম্ করে বোমা ফাটলো, কামান গর্জে উঠলো। কতজন যে মরলো তার হিসাব নেই। মিলিটারী যাকে সামনে পেলে ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে পুরলো, জেলের মধ্যে অত্যাচারে কতজন মারা গেল। মিলিটারী কত গাঁ লুঠ করলো, কত বাড়ী জ্বালিয়ে দিল, কিন্তু এই বিপ্লবের নায়ক পবিত্র-মোহন প্রধানকে তারা পাকড়াও করতে পারলো না। তিনি আত্মগোপন করলেন।

আসামের গোপুর থানার লোকেরা এক মিছিল বের করলো, মিছিল

এগিয়ে চলল থানার দিকে। সবার আগে ছিল চৌদ্দ-পনেরো বছরের এক মেয়ে, তার নাম কনকলতা। হাতে এক বিরাট নিশান। থানার সামনে আসতেই দারোগা পথ আটকে দাঁড়ালো, বললো—কোথায় যাও?

কনকলতা বললেন—আমরা থানার মাথায় নিশান তুলবো, এ থানা আমাদের।

দারোগা বললো—না, তোমরা তা পার না।

কনকলতা বললেন—এদেশ আমাদের দেশ, এদেশের মাটিতে কোন বিদেশীর কোন অধিকার নেই, আমাদের জাতীয় পতাকা থানার মাথায় উড়বেই!

দারোগা ভয় দেখালো—আমি গুলি চালাবো।

কনকলতা বললেন—আমরা এগুবো!

কনকলতা এক পা অগ্রসর হতে না হতেই দারোগা গুলি চালালো—কনকলতা লুটিয়ে পড়লেন, কিন্তু তাঁর হাতের পতাকা মাটিতে পড়লো না। তাঁর পিছনেই ছিল মুকুন্দ কাকুতি নামে একটি ছেলে, সে নিশানটা তুলে নিয়ে থানার ভিতরে ঢুকে পড়লো। দারোগা আবার গুলি চালালো, মুকুন্দ লুটিয়ে পড়লো মাটির উপর। কিন্তু ইতিমধ্যে আরেকদল ছেলে পিছনের পাঁচিল টপ্‌কে থানার মধ্যে ঢুকে পড়লো। থানার মাথায় তারা উড়িয়ে দিল এক নিশান, ধ্বনি উঠলো—বন্দেমাতরম্! ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ!!

মহাকোশলের শ্রীমতী কাশীকারও এইভাবে প্রাণ দেন।

ঠিক এম্‌নি আরেকটি ঘটনা ঘটে ধিকিয়াজুলি থানায়। সেখানেও সবার আগে গুলি খেয়ে মরে এক বারো বছরের মেয়ে ফুলেশ্বরী, তারপরেই একটি ছেলে। শহর থেকে গোরা সৈন্য অসে, তারা একটা হাটকে কংগ্রেসের মিটিং মনে করে খুসিমত গুলি চালিয়ে যায়। শ'খানেক লোককে খুনজখম করেও সৈনিকদের নায়ক খুসি করতে পারলো না, ছুটলো হাসপাতালে, সেখানে রোগীদের দেখে, বুকের উপর পিস্তল উঁচিয়ে ধরে চীৎকার জুড়ে দিলো—তুম্‌লোগ্‌ গুণ্ডা হ্যায়!

নওগাঁর বিবিজিয়া পুলের নীচে সৈনিকেরা লুকিয়ে থাকতো, যেমন ভাবে শিকারীরা বন্দুক বাগিয়ে বাঘ মারতে অপেক্ষা করে মাঁচার উপর; সন্ধ্যাবেলা কেউ পুল পার হতে গেলেই তাকে গুলি করে মারতো। দু'তিন জনকে মারার পর জানাজানি হয়ে গেল। পুলের ধারে আর কেউ যায় না। সৈন্যরা আর কত চুপ করে থাকবে, শেষে এক রাত্রে তারা বিবিজিয়া গাঁয়ে এসে ঢুকলো। কত বাড়ীর দরজা ভেঙে লুঠ করলো, তারপর গাঁ শুদ্ধ চারশো মেয়ে-পুরুষকে জড়ো করে হুকুম দিল—থানায় চলো!

থানা ন' মাইল দূর। সাড়ে চার ক্রোশ পথ একটানা যাওয়া সহজ কথা নয়। তিন দিনের শিশু কোলে একটি মেয়েকে আঁতুড় ঘর থেকে টেনে আনা হয়। শিশুটি পথেই মারা যায়, আর মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে পড়ে; তার রীতিমত সুস্থ হতে কয়েক মাস লেগেছিল।

গাঁ শুদ্ধ লোককে গ্রেপ্তার করে মিলিটারী বাড়ীতে বাড়ীতে আগুন লাগাচ্ছে, এমন সময় একটি বালক ভীড়ের মধ্যে থেকে সাড়া তুললো—কেন আমাদের বাড়ী পোড়াবে? কেন আমরা তোমাদের অত্যাচার সইব?

আর যায় কোথা, সেনাপতি চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলো—কে? কে কথা বললে?

ছেলেটি এগিয়ে এলো, বললো—আমি বলেছি। তোমাদের এই অন্যায় জুলুম বন্ধ কর!

বীর সেনাপতি তখনই ওইটুকু ছেলেকে মারলো এক লাথি, তারপর ছেলেটি পড়ে যেতেই তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল জ্বলন্ত আগুনের মাঝে। ছেলেটির নেহাৎ বরাত জোর বলতে হবে তাই পুড়ে মরেনি, আগুনের ভিতর থেকে কোন রকমে সে বেরিয়ে এলো, তার দেহের অনেক জায়গা তখন ঝল্‌সে গেছে।

বহরমপুরে মেয়েরা পিক্‌নিক্ করতে বেরিয়েছিল শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে। কেমন করে জানি না, পুলিশ খবর পেয়েই ছুটে এলো। সামনেই চোখ পড়লো রত্নমালা নামে ছোট একটি মেয়ের হাতে একটি তিনরঙা নিশান। আর যায় কোথা, পুলিশ নিশানটি কেড়ে নিয়ে তাকে

ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল। কাছেই ছিল তার ঠাকুরমা ভোগেশ্বরী কুকোননী, হাতের লাঠিটা নিয়ে তিনি বসিয়ে দিলেন সেনাপতির মুখে এক ঘা, কপাল ফেটে রক্ত ঝরলো। সেনাপতি তখনই বুড়ীকে গুলি করে মারলো। এবার মেয়েদেরকে বাঁচাবার জন্যে চারিপাশ থেকে অনেক লোক এগিয়ে এলো, পুলিশ তাদের উপর গুলি চালাতে সুরু করলো। সবার আগে গুলি এসে লাগলো লক্ষ্মীরাম হাজারিকার বুকে।

সৈন্যরা চলে যাবার পর যখন সবাই তাঁকে ধরে তুললো, তখন তাঁর শেষ সময়। পকেট থেকে শেষ সম্বল ছ'টি পয়সা বের করে সঙ্গীদের হাতে দিয়ে লক্ষ্মীরাম বললেন—আর কিছু নেই, এই ক'টা পয়সা দেশের কোন কাজে লাগিয়ে দিও!

অনেক গাঁয়ে ছু'সারি সৈন্য দাঁড় করিয়ে গাঁয়ের মেয়ে পুরুষ ও শিশুদের হুকুম দেওয়া হোত তাদের মাঝখান দিয়ে মার্চ করে যাবার। তারা এক-পা এক-পা করে এক একজন সৈনিককে পার হোত আর এক ঘা করে প্রহার খেতে হোত,—কেউ মারত ঘুসি, কেউ লাথি, কেউ চড়। লাইনের শেষে গিয়ে যখন তারা পৌঁছাতো তখন কারুর চোখে-মুখে কালশিরা পড়ে গেছে, কেউ-বা রক্তাক্ত।

একদিন পুলিশ ছুটি লোককে ধরে আনলো—কোশল কানোয়ার ও কমল মিরি। কোশল কানোয়ার ছিলেন আসামের অহোম রাজবংশের ছেলে, কংগ্রেসের কাজে জীবন পণ করেছিলেন। পুলিশ অভিযোগ তুললো—কোশলই নাকি 'মৃত্যুবাহিনীর' সর্দার, যারা কয়েকখানি ট্রেন লাইনচ্যুত করেছে। কোশলের উপর ফাঁসীর আদেশ হোল, কিন্তু তাঁর মুখের হাসি মিলালো না, সঙ্গীদের বললেন—জন্মালে একদিন তো মরতে হবেই। ভগবান আমাকে বেশী ভালবাসেন কিনা, তাই সবার আগে তিনি আমাকেই ডেকে নিলেন, আমাকে দিয়ে যেটুকু কাজ করাবার ছিল করিয়ে নিয়েছেন।

ফাঁসীর দিন সঙ্গীদের কাছ থেকে হাসতে হাসতে কোশল কানোয়ার

বিদায় নিলেন, ফাঁসীর দড়ি গলায় পরার আগে গান ধরলেন—পার কর দীননাথ, সংসার-সাগর।—

কমল মিরি ছিলেন আদিবাসী, গোপীনাথ বরদলৈ-এর কাছে তিনি শেখেন চরকা কাটতে আর অ-আ-ক-খ পড়তে। জেলের মধ্যেই কমলের অসুখ করে। ভালো চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা না থাকায়, জেলের কর্তারা বললেন—কমল, তুমি লিখে দাও স্বদেশীর কাজে আর থাকবে না, তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি।

কমল হেসে বললেন—আপনারা কি যে বলেন তাতো বুঝি না, স্বদেশীর কাজ কি আমি নিজের জন্য কিছু করেছি, সে আমাদের সবাইকার জন্য। আমি বন্ধ করলেই কি স্বদেশী বন্ধ হবে? আপনারা মিছামিছি আমাকে জ্বালাতন করছেন।

কমল মিরি জেলখানাতেই মারা গেলেন।

গোয়ালপাড়ায় পুলিশ নিধন রাজবংশীর অকারণে আট টাকা জরিমানা করলো। একজন গরীব চাষীর পক্ষে আট টাকা দেওয়া সহজ কথা নয়। চৌকিদার টাকা না পেয়ে তার বলদ-জোড়া টেনে নিয়ে যেতে চাইল। নিধু বললো—বাবু, আমার বলদ দুটো নিয়ে গেলে ক্ষেতে লাঙল ঠেলবো কিসের জোরে, সবাই মিলে উপোসী মরবো যে!

চৌকিদার খালি হাতেই ফিরে গেল। তার মুখ থেকে এস্-ডি-ও এই খবর শুনে, দু' লরী গোরা সৈন্য নিয়ে এসে উঠলো নিধুর বাড়ীতে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, নিধু ঘরের মধ্যে বসে কি কাজ করছিল। সিপাই হাঁক দিল—বাহার আও!

নিধু ভয় পেয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। গোরা সৈন্য জানালার ভিতর দিয়ে গুলি চালালো। একটা গুলি মেটে দেয়াল ফুটো করে ওপাশের এক সিপাইকে বিঁধলো, সিপাইটি তখনই মারা গেল। আর যায় কোথা, সৈন্যদের যত রাগ গিয়ে পড়লো নিধুর উপর। দরজা ভেঙে তারা ঘরের মধ্যে ঢুকলো, পায়ে গুলি লেগে নিধু রক্তাক্ত হয়ে পড়েছিল, বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সৈনিকেরা তাকে সেখানেই শেষ করলো।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা বিরাট এক মিছিল বের করলো। দু'দিন তারা পথে পথে ঘুরলো, পুলিশ কোথাও কিছুই বললো না। শেষে যখন তারা কালেক্টরী কোর্টের সামনে এলো, তখন পুলিশ বন্দুক উঁচিয়ে ধরলো তাদের উপর। মিনিট পনেরো দু'দল মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল, হঠাৎ কোথা থেকে সিটি ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের ডেপুটি সুপার আবির্ভূত হোল; আদেশ দিলে—মিছিল ভেঙ্গে দাও, যে যার বাড়ী চলে যাও!

কিন্তু ছেলেমেয়েদের দিক থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। আদেশ হোল—গুলি চালাও!

কিন্তু সৈন্যরা গুলি চালাবার আগেই ছাত্র-ছাত্রীরা মাটির উপর শুয়ে পড়লো, গুলি ছুটে গেল মাথার উপর দিয়ে। পরক্ষণেই ছেলেমেয়েরা লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো, চীৎকার করে উঠলো—বৃটিশ, ভারত ছাড়ো!

আবার আদেশ হোল—গুলি চালাও!

আবার ছেলেমেয়েরা শুয়ে পড়লো। কিন্তু লাল-পদম্ বাহাদুর নামে একটি ছেলে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রইল তাদের মাঝে, তখনই গুলি খেয়ে সে লুটিয়ে পড়লো সেখানে। পরক্ষণেই ছেলেরা দাঁড়িয়ে উঠলো, চীৎকার তুললো—ভারত ছাড়ো!

আবার গুলি চললো,—এবার পড়লো অনেকে। কিন্তু পালালো না কেউই।

অবস্থা সুবিধাজনক নয় দেখে, শেষে পুলিশের দল পিছু হটে গেল। শোভাযাত্রা এগিয়ে গেল সামনের দিকে। জয়ী তারা হোল, কিন্তু একটা কথা ছাত্রদের মনে উঠলো,—এভাবে বিনা কারণে গুলি খেয়ে লাভ কি? বিশ্ববিদ্যালয়ের কমন্-রুমে সভা বসলো। দু'দিন আলোচনা হোল, স্থির হোল—শহর ছেড়ে সবাইকে গাঁয়ে যেতে হবে, গাঁয়ে গাঁয়ে বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব জাগিয়ে তুলতে হবে। পরদিনই ছাত্র-ছাত্রীরা গাঁয়ের পথে পা বাড়ালো।

অন্ধকূপ হত্যার কথা আমরা বইয়ে পড়েছি, সে দু'শো বছর আগের

এক মিথ্যা কাহিনী। কিন্তু এই ইংরেজ-আমলেও সেদিন এই রকমই ব্যাপার সত্যই ঘটেছিল চিমুরে। পুলিশ ১৫০ জন লোককে একখানি ঘরে ভরে রেখেছিল ছ'দিন ধরে। তারাও যে মানুষ সে-কথা গোরা সৈন্যদের মনে ছিল না।

চিমুরের পাশেই অস্তি। বিপ্লবের ঢেউ সেখানেও এলো। সেখানকার দারোগাবাবু আর পাঁচজন দারোগার মতই স্বদেশীর শত্রু। একদল মানুষের উপর গুলি চালিয়ে তিনি বীরত্ব দেখালেন। যারা গুলি খেয়ে জখম হোল, তারা মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগলো। বার বার সাড়া তুললো—জল! একটু জল!! দারোগাবাবু দলবল নিয়ে পাহারা দিচ্ছে, কেউ এগুলেই তাকে গুলি করবে। কিন্তু আহতের আর্তনাদে জনতা চঞ্চল হয়ে উঠছে। শেষে মরিয়া হয়ে এগিয়ে গেলেন এক মহিলা,—শ্রীমতী নাগপুরী। দারোগা তখনই তাঁকে গুলি করে মারলো। জনতা আর সইতে পারলো না, পুলিশের উপর তখনই ঝাঁপিয়ে পড়লো। অস্ত্রের সঙ্গে নিরস্ত্রের লড়াই বেধে গেল। নিরস্ত্রেরাই জিতলো, থানা জ্বালিয়ে দিল।

রামটেকের ক'জন নেতাকে ধরে পুলিশ যখন ট্রেনে করে চালান দিচ্ছে, জনতা ট্রেন আক্রমণ করলো, বললো—নেতাদের মুক্তি চাই! পুলিশ গুলি চালাবে কি-না ভাবছে, এমন সময় জনতা তাদের হাতের বন্দুক কেড়ে নিয়ে ফেলে দিল, নেতাদের বের করে আনলো ট্রেনের কামরা থেকে।

সাতারা অঞ্চলে সহ্যাদ্রি পাহাড়ের বুকে রীতিমত লড়াই বেধে গেল। একদিকে 'তুফান সেনা', আরেকদিকে বৃটিশ ফৌজ। এই তুফান সেনায় লোক ছিল মাত্র হাজার খানেক, মহারাষ্ট্রের শ' দুয়েক গাঁয়ে তাদের ছিল অবাধ প্রতিপত্তি। দু'টি বছর ধরে এরা রীতিমত গেরিলা যুদ্ধ চালায় বৃটিশ ফৌজের সঙ্গে। আজ পুলিশ-চৌকি পুড়িয়ে দিল,…কাল ট্রেনে যুদ্ধের রসদ যাচ্ছে, লুঠে নিল,…একদিন রাত্রে আচম্বিতে থানার মাঝে চড়াও হয়ে পুলিশের বন্দুকগুলো কেড়ে আনলো…এই ভাবেই চললো মাসের পর মাস। চাষীদের সুযোগ-সুবিধা করে দিয়েছিল বলে সাতারার চাষারা

এদের ভালবাসতো। মিলিটারীরা সেইজন্য শত চেষ্টা করেও এদেরকে ধরতে পারতো না। তা ছাড়া এদের গুপ্তচর ছড়িয়ে ছিল সারা দেশ জুড়ে। কেউ পুলিশে খবর দিয়েছে একবার জানতে পারলে তাকে ধরে পায়ের বুড়ো আঙুল দুটি এমন ভাবে জখম করে দিত যে, সে কিছুদিন আর চলাফেরা করতে পারতো না। এই সাজাকে ওদেশের লোকেরা বলে 'পত্রী'। সেই থেকে এই দলের শাসন-আমলকে লোকে নাম দিয়েছিল— পত্রী-সরকার। এদের নেতা ছিলেন কমরেড কতোয়াল, তিনি সিদ্ধ-গড়ের পাহাড়ে বৃটিশ ফৌজের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করে মারা যান। তখন দলের নেতা হন নানা পাতিল। দু'বছর চেষ্টা করেও ইংরেজ ফৌজ তাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারেনি।

বোম্বাইয়ে হাঙ্গামা বড় কম হয়নি। সেখানে ছাত্রেরা হাঙ্গামা করে দেখে গবর্মেণ্ট ১৬০০ শিক্ষককে একদিনে বরখাস্ত করে বললেন—মাষ্টাররা ছাত্রদের ঠিক মত শিক্ষা দিতে পারেননি বলেই এই সব হচ্ছে, শিক্ষকরা সব অযোগ্য।

বিদ্রোহকে আয়ত্তে আনার জন্য সুপারিনটেণ্ডেণ্ট পুলিশকে উপদেশ দিলে—'কেউ বন্দে-মাতরম্ বলে চীৎকার করলে তার চোয়াল ভেঙ্গে দেবে! কোনখানে কেউ একটা ঢিল ছুড়লে সেখানে ২০টি গুলি ছুড়বে! একটা পুলিশ কোথাও খুন হলে চারি পাশের একশো লোককে খুন করবে! যদি লাঠি চালাতে চালাতে হাতে ব্যথা হয় গুলি চালাবে!' পুলিশ সে আদেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করেছিল, কিন্তু তবু মানুষের মন থেকে স্বাধীনতার আকাঙ্খা তাড়ানো যায়নি। ছেলেকে পুলিশ ধরেছে, পিতা এসে বলছেন—পুলিশকে একটু লিখে দে যে আর স্বদেশী করবো না, তাহলেই তোকে পুলিশ ছেড়ে দেবে, নাহলে জেলে যেতে হবে, জেলে বড্ড কষ্ট!

ছেলেটি হেসে বললো—বাবা, তুমি ভুল করছ, জেলে আমার কোন কষ্টই হবে না!

ছেলে গুলি খেয়ে মরলো, পিতা মরা ছেলেকে কোলে নিয়ে কেঁদে

ফেললেন, সজল চোখে বললেন—আমার একমাত্র ছেলে মারা গেল, দুঃখ রাখার জায়গা নেই, তবু দেশের জন্য আমার ছেলে মরেছে, এই আমার গর্ব !

জেলে কয়েদীদের চেয়ারে ইলেকট্রিক চার্জ করে কথা বের করার চেষ্টা করা হোত, বরফের উপর শুইয়ে রাখা হোত, হাঁটুর উপর হাতুড়ি পেটানো হোত, জল ও আহার বন্ধ রাখা হোত দিনের পর দিন। তবু মানুষ দেশের নামে জেলে যাবার জন্য সব সময় এগিয়ে আসতো। পুলিশ এক সভায় এলো সভাপতিকে ধরতে, জিজ্ঞাসা করলো—নেতা কে ? সবাই এগিয়ে এলো—হাম লীডার হুঁ।

পুলিশ জিজ্ঞাসা করলো—কিস্‌নে বনায়া তুম্‌কো লীডার !

উত্তর হোলো—কংগ্রেস্‌নে !

পুলিশ এক সভায় মেয়েদের গায় হাত তোলে, সামনেই ছিল বছর ষোলর একটি ছেলে। একখানি রাম-দা (ধরিয়া) নিয়ে সে ছুটে গেল পুলিশের সামনে, বললো—কুত্তার দল, তুই যদি হিন্দুস্থানের মরদ হোস্‌, এগিয়ে আয়, সামনাসামনি লড়ে যা !

কিন্তু লড়বে কে, পুলিশ পিছিয়ে গেল।

সিন্ধুর আন্দোলনে হিমু কালানীর নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। স্থক্কুরে সতেরো-আঠারো বছরের এই ছেলেটিকে সামরিক বিচারে ফাঁসি দিয়ে ইংরেজ তার রাজ্য রক্ষা করে। সেখানে যত গুণ্ডা ছিল সবাইকেই সিভিক-গার্ড করা হয়, তারা লোকের বাড়ী-বাড়ী ঢুকে গুণ্ডামি করে। কংগ্রেসী যারা ধরা পড়তো, তাদেরকে পুলিশ নিজেদের বুটের উপর নাকে খৎ দিতে বলতো। তারপর তাকে মাটিতে ফেলে, তার বুকের উপর বসে তাকে রীতিমত প্রহার দিত।

পাঞ্জাবের বাচ্ছিতর সিংয়ের কাহিনী ভারী মজার। বাচ্ছিতর মিলিটারী ডিপোর যন্ত্র-বিশেষজ্ঞ হিসাবে কাজ করতেন, পাঞ্জাবের আন্দোলন সম্পর্কে পুলিশ তাঁকেই ধরলো। মোটরে করে সহর-কোতোয়ালিতে নিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় পথে নদীর ধারে মোটর গেল বিগড়ে। মোটর থেকে নেমে সবাই টাংগায় উঠলো, সেই ফাঁকে বাচ্ছিতর সিং কোথায়

হারিয়ে গেল। খোঁজ—খোঁজ। পুলিশ গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের করে দিল। কিন্তু বাচ্ছিতর তখন সাঁতরে নদী পার হয়ে কলিকাতার এক ট্রেনে গিয়ে উঠেছে। কলিকাতায় এসে বাচ্ছিতর নাম বদলে ফেললো—যশোবন্ত সিং। এক জাহাজে চাকরী নিয়ে রীতিমত কলিকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেল। পুলিশ সব রকমে চেষ্টা করেও কোন হদিশ পায় না। বছর তিনেক বাদে বাচ্ছিতরের স্ত্রী আর শাশুড়ী কলিকাতায় এলো। সোহনলাল নামে এক পুলিশ তখন তাদের পিছু নিল। কলিকাতায় সোহনলাল বাচ্ছিতরকে ধরে ফেললো। আর একদিন সময় পেলে বাচ্ছিতর জাহাজে বর্মা চলে যেতেন।

বাচ্ছিতরের সঙ্গে আরেকটি লোকের নাম করতে হয়,—হরবংশ লাল। পুলিশ তাঁর মুখ থেকে দলের কথা বের করার চেষ্টা করে। কোর্টে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে যখন তাঁকে দাঁড় করানো হয় তখন তিনি কিছু বলবেন না বলেই ঠিক করেন, আদালতের মাঝেই তিনি বিষ খেয়ে দেহত্যাগ করেন, তখনও তাঁর হাতে হাতকড়ি লাগানো।

সীমান্তের স্মরণীয় ঘটনা—মর্দানের মাঠে খোদাই-খিদমৎগারদের উপর পুলিশের লাঠি চালানো। খান আবছুল গফুর খাঁ ছিলেন দলের আগে। পুলিশ তাঁর ছু'খানি পাঁজরা ভেঙ্গে দেয়। সীমান্তের গান্ধী অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান, সেই অবস্থাতেই পুলিশ তাঁকে টেনে নিয়ে যায় জেলে।

একে আন্দোলন বলার চেয়ে ভারতব্যাপী বিদ্রোহ বলাই ভালো। মোটামুটি খুন-জখমের যেটুকু হিসাব জানা যায়, তা' থেকেই ব্যাপারটি কত বিরাট তা বোঝা যাবে ঃ

বাংলা—	কলিকাতায় দশ দিনে	২০	জন	নিহত,
	কাঁথীতে গুলি খেয়ে	৩৯	„	„
	তমলুকে ...	৪১	„	„
	বালুরঘাটে ...	৪	„	„
	শিলিগুড়িতে ...	৩	„	„
		১০৭		

বিহার—	মোকামায়	...	১৪ জন নিহত
	হিলসায়	...	৪ " "
	ডুমরাঁওয়ে	...	৪ " "
	কাইলওয়াড়ে	...	১ " "
	সাতপাহাড়ে	...	১ " "
	বিহিয়াতে	...	৪ " "
	জামুয়ায়	....	১ " "
	কেট্সে	...	৩ " "
	কোবাসরাইয়ে	...	১ " "
	ব্রহ্মপুরে	....	১ " "
	ভাগলপুরে	...	২৮০ " "
	পীরপৈঁটিতে	...	৩৭ " "
	সুলতানগঞ্জে	...	৬৭ " "
	কাটিহার অঞ্চলে	...	৪৫ " "
	বেতিয়া অঞ্চলে	...	২২ " "
	দ্বারবঙ্গে	...	৩৭ " "
	গয়ায়	...	১০ " "
	হাজারিবাগে	...	৮৮ " "
	ঝরিয়া অঞ্চলে	...	২ " "
	পুপরি অঞ্চলে	...	৫০ " "
			৬৭২
উড়িষ্যা—	কোরাপুট ও কটক জেলে		৫১ " "
	আওরঙ্গাবাদে	...	৪ " "
	এরামে	...	২৮ " "
	ধামনগরে	...	১০ " "
	কোরাপুটে	...	৩৪ " "
			১২৭

আসাম—	ধিকিয়াজুলিতে ...	২৪ জন	নিহত
	নওগাঁয় ...	৭ „	„
	গোয়ালপাড়ায় ...	১ „	„
		৩২	
যুক্তপ্রদেশ—	... ...	২২৩ জন	নিহত
মধ্যপ্রদেশ—	চিমুরে ...	১৫ „	„
	অস্তিতে ...	কয়েকজন	„
	নাগপুরে ...	কয়েকজন	„
	জুনাগড়ে ...	২ „	„
		১৭	

এত বড় সংগ্রামের মধ্যেও কংগ্রেসীদের মন ছিল পবিত্র। গবর্মেণ্টকে অচল করার জন্য যা কিছু করা ঠিক বলে মনে করতো, তা তারা করতো, কিন্তু কারুর ব্যক্তিগত কোন সম্পত্তির প্রতি তাদের লোভ ছিল না। একদিন এক হাংগামা-হুল্লোড়ের মধ্যে বোম্বাইয়ের এক চাষা উত্তেজনার বশে এক মেম সাহেবের ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে চলে আসে, কিন্তু একটু পরে মাথাটা ঠাণ্ডা হলেই যখন সে বুঝতে পারে যে কাজটা তার অন্যায় হয়েছে, তখনই সে মেম সাহেবের বাড়ী খুঁজে বের করে থলিটি তাকে ফেরৎ দিয়ে আসে এবং ক্ষমা চায়।



ইংরেজের অত্যাচার যখন চরমে গিয়ে উঠেছে, তখন লোকমান্য তিলক মহারাষ্ট্রে শিবাজী-স্মৃতিপূজার প্রবর্তন করলেন। অত্যাচারী ঔরঙ্গজীবের বিরুদ্ধে শিবাজী তলোয়ার ধরেছিলেন, অত্যাচারী ইংরেজদের বিরুদ্ধে তলোয়ার ধরার জন্য মারাঠী যুবকেরাও উৎসুক হয়ে উঠলো, দু'জন মারাঠী ব্রাহ্মণ—দামোদর চাপেকার ও বালকৃষ্ণ চাপেকার—দুই ভাই এক সমিতি করলেন—'হিন্দুধর্মের বিঘ্ন অপসারণ সমিতি।'

বোম্বাইয়ে তখন প্লেগের মহামারী দেখা দিয়েছে। এই মহামারী বন্ধ করার জন্য গবর্মেণ্ট এক 'প্লেগ প্রতিষেধক কমিটি' করলেন। সাহেবদের কমিটি। যখন-তখন সাহেবরা লোকের বাড়ী ঢুকে জিনিষপত্র ওলোট-পালোট করে দেখতে লাগলো—প্লেগ বন্ধ করার নামে সুরু হোল অত্যাচার। দেশ সুদ্ধ লোক তো ক্ষেপে উঠলো।

সেদিন রাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক-জুবিলী উৎসব হচ্ছে—ষাট বছর রাজত্ব পূর্ণ হয়েছে। বোম্বাইয়ের লাটের বাড়ীতে বেজায় ধূমধাম। খানা-পিনা শেষ করে প্লেগ কমিটির কর্তা র‍্যাণ্ড-সাহেব আর তার সহকারী লেফ্‌টেন্যাণ্ট আয়ারস্ট বাড়ী ফিরছিল, পথে দামোদর ও বালকৃষ্ণের হাতে তারা খুন হোল।

বোম্বাইয়ে রাণী ভিক্টোরিয়ার যে মর্মর মূর্তিটি ছিল, জয়ন্তীর দিনে দামোদর তাতে আলকাতরা মাখিয়ে কদাকার করে দিল।

ছু'ভাইকেই পুলিশ ধরলো খুনের দায়ে। দামোদরের ফাঁসী হয়ে গেল।

সমিতি এবার অন্য পথ ধরলো। কাথিয়াবাড়ের শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা বিলাতে গেলেন। সেখানে বিখ্যাত ধনী পার্শী মহিলা শ্রীমতী কামার সহায়তায় তিনি 'ইণ্ডিয়া হোমরুল সোসাইটি' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন, সঙ্গে সঙ্গে একখানি কাগজও বের করেন 'ইণ্ডিয়ান-সোসিওলজিস্ট' নামে। এঁরা প্রতিবছর ভারতের ছ'জন ছেলেকে হাজার টাকা করে ছ'টি বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করেন য়ুরোপ ও আমেরিকায় শিক্ষালাভের জন্য। বিনায়ক দামোদর সাভারকর এই বৃত্তি নিয়ে বিলাতে গেলেন, সেখানে ভারতীয়দের সমিতি 'ইণ্ডিয়া-হাউস'এ তিনি বিপ্লবীদের আড্ডা করলেন। সদস্যদের শেখাতে স্থুরু করলেন কি করে রিভলভার ছুড়তে হয়, আর চিনিয়ে দিলেন কারা ভারতের শত্রু।

মদনলাল ধিংড়া এই দলের একজন। লণ্ডনের ইম্‌পিরিয়াল ইন্‌স্টিটিউটের এক সভা হচ্ছিল, ভারত সরকারের রাজনৈতিক এ. ডি. সি. কর্ণেল স্যার উইলিয়ম কার্জন ওয়াইলি বক্তৃতা করছিলেন, ধিংড়া তাঁর উপর গুলি চালালেন। ওয়াইলি মারা গেলেন, মদনলাল ধরা পড়ে গেলেন। তাঁর পকেটে একখানি কাগজ পাওয়া গেল, তাতে লেখা ছিল—ভারতীয় যুবকদের নির্বিচারে জেলে পাঠানো ও ফাঁসী দেওয়ার প্রতিবাদে আমি স্বেচ্ছায় ইংরেজের রক্তপাতের চেষ্টা করলাম।

ওয়াইলি এদেশে সরকারী দমন-নীতির বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। মদনলালের ফাঁসী হয়ে গেল।

এই সম্পর্কে বিনায়ক সাভারকরকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলো। ভারতীয় হিসাবে আদালতে বিচারের জন্য তাঁকে এদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা হোল। জাহাজ মার্শেই বন্দরে যখন নোঙর করেছে, তখন সান্ত্রীর চোখকে ফাঁকী দিয়ে বিনায়ক জাহাজের এক ফুকর দিয়ে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়লেন, সাঁতরে গিয়ে উঠলেন ফ্রান্সের উপকূলে। পিছনে তখন ইংরেজ পুলিশ তাড়া করেছে। বিনায়ক ছুটে গিয়ে ফরাসী পুলিশের হাতে ধরা দিলেন। ফরাসী পুলিশ তখনই সাভারকরকে ইংরেজ সান্ত্রীর হাতেই সমর্পণ করলো। আইনতঃ ফরাসী পুলিশের কাজটা হোল বে-আইনী। এক রাজ্যের রাজনৈতিক অপরাধী আরেক রাজ্যে যদি ধরা পড়ে, তাহলে জেনেভার আন্তর্জাতিক আদালতেই তার বিচার হয়। সাভারকরের বেলাতেও তাই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা আর হোল না। বোম্বাইয়ের আদালতে বিনায়কের বিচার হোল, চৌদ্দ বছর করে দু'দফায় আটাশ বছর দ্বীপান্তর হোল।

বিনায়কের বড় ভাই গণেশ রাজদ্রোহী কবিতা লিখতেন, সেই অপরাধে এর আগেই পুলিশ তাঁকেও দ্বীপান্তরে চালান দিয়েছিল।

জ্যাক্‌সন নামে এক ম্যাজিস্ট্রেট এঁদের বিচার করেন, বিপ্লবীদের গুলিতে তিনি নিহত হন। এই সম্পর্কে পুলিশ তিনজনের ফাঁসী দেয়।

বিপ্লবের ঢেউ বাংলাতেও উঠেছিল। এখানে বিপ্লবী তৈরী করার জন্য একে একে অনেকগুলি সমিতি গড়ে ওঠে। পি. সি. মিত্র প্রতিষ্ঠা করলেন 'অনুশীলন সমিতি', বিপিন গাঙ্গুলি ও অনুকূল মুখোপাধ্যায় গড়ে তোলেন 'আত্মোন্নতি সমিতি', হেমেন্দ্রকিশোর আচার্যের 'সুহৃদ ও সাধনা সমিতি', অশ্বিনীকুমার দত্ত ও সতীশ মুখোপাধ্যায়ের (প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী) 'স্বদেশ-বান্ধব-সমিতি' এবং যতীন রায়ের দল!

এই সব দলগুলির মন্ত্রণাদাতা ছিলেন যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার ছেলেদের রীতিমত সৈনিক করে গড়ে তোলার জন্য ইনি নিজে রীতিমত সামরিক শিক্ষা আয়ত্ত করেন। বৃটিশ ভারতে সে সুবিধা না থাকায় ইনি

বরোদা রাজ্যে যান, সেখানে উপাধ্যায় নাম নিয়ে তিনি ঘোড়-সওয়ারের চাকরী লন এবং সামরিক কায়দা-কানুন শিখে এসে সমিতির বিপ্লবী ছেলেদের তা শেখান।

তখন শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ বরোদায় চাকরী করতেন, উপাধ্যায়ের সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর আলোচনা হয়। শ্রীঅরবিন্দ একবার কলিকাতায় আসেন, ছোট ভাই বারীনও সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু তখন কাজের কোন সুবিধা না হওয়ায় ফিরে যান।

ইতিমধ্যে বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু হোল। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হোল। কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুলো—'অধ্যক্ষ চাই, বেতন পঁচাত্তর টাকা মাত্র।' শ্রীঅরবিন্দ ইতিপূর্বে ভগিনী নিবেদিতা ও আরো অনেকের সঙ্গে আলোচনা করে বাংলাদেশে ফিরে আসার জন্য তৈরী হয়েছিলেন, এবার সাড়ে সাতশো টাকা মাইনের চাকরী ছেড়ে এই পঁচাত্তর টাকা মাইনের চাকরী নিয়ে তিনি বাংলাদেশে এলেন। 'বন্দেমাতরম্' কাগজের সম্পাদক হলেন। তাঁর চারিপাশে একটি দল গড়ে উঠলো—ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ প্রভৃতি সেই দলের শক্তিবৃদ্ধি করলেন।

ছোটভাই বারীনও এলেন শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে। তিনিও একখানি বাংলা কাগজ বের করলেন—'যুগান্তর' ; সম্পাদক হ'লেন ভূপেন দত্ত, আর তাঁর সঙ্গে রইলেন উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত, হেমচন্দ্র কানুনগো প্রভৃতি। এই কাগজখানির জন্য এঁদের নাম হোল 'যুগান্তরের দল'। বাংলার সমস্ত সমিতিকে এঁরা এক করলেন। এঁদের কাজ হোল গোপনে বোমা তৈরী করা আর কাগজে বিপ্লবের আগুন ছড়ানো। ভারতের তিনজন নামকরা নেতা এঁদের এই কাজকে সমর্থন জানালেন—পশ্চিম ভারতের বালগঙ্গাধর তিলক, উত্তর ভারতের লালা লাজপত রায় আর পূর্ব ভারতের বিপিনচন্দ্র পাল।

এঁরা প্রথম বোমা মারার চেষ্টা করেন বাংলার ছোটলাট স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজারের ট্রেনে। ফ্রেজার সাহেবের স্পেশ্যাল ট্রেন যাবে, বিপ্লবীরা

যথাসময় মানকুণ্ড ও চন্দননগরের মধ্যে রেল লাইনের উপর ডিনামাইট কার্তুজ রেখে দিলেন। হুস্ হুস্ করে ট্রেন চলে গেল, ফট্ ফট্ করে হুটো পট্কা ফাটার শব্দ হোল মাত্র, গাড়ীখানি এতটুকু হেললো না।

বিপ্লবীরা আবার চেষ্টা করলেন। কলিকাতার ওভারটুন হলের এক সভায় লাটসাহেব বক্তৃতা করছিলেন, যতীন রায় নামে একটি ছেলে তাঁর উপর গুলি চালালো। গুলি লাগলো না, যতীন ধরা পড়লো, তার দশ বছর জেল হোল।

তৃতীয়বার বিপ্লবীরা চেষ্টা করলো মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড়ে। বারীন নিজে গিয়ে রেল লাইনের ধারে বোমা পুঁতে রেখে এলেন। ট্রেন আসতেই বোমা ফাটলো। রেল লাইন উড়ে গেল, ইঞ্জিনের কিছু ক্ষতি হোল, কিন্তু লাটসাহেব বেঁচে গেলেন। খড়গ্পুর থেকে আরেকখানি ট্রেন এসে লাটের স্পেশ্যালকে টেনে নিয়ে গেল। আসামীকে ধরার জন্য পুলিশ পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করলো। তারপর জনকতক রেলের কুলিকে ধরে পাঁচ-দশ বছর জেলে দিল।

লাটসাহেবের পরেই বিপ্লবীদের চোখ পড়লো প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের উপর। অধিকাংশ স্বদেশী মামলার তিনিই বিচার করতেন লোকটি ছিলেন অত্যন্ত কড়া মেজাজের। স্বদেশীওলাদের ইনি হু'চোখে দেখতে পারতেন না। বিপিন পালের মামলার দিন সুশীল সেনকে বেত-মারার হুকুম দিয়েছিলেন ইনিই।

একদিন সন্ধ্যাবেলা আদালত থেকে কিংস্ফোর্ড বাড়ী ফিরছিলেন, টালিগঞ্জের মোড়ে একটি ছেলে এসে তার হাতে একখানি মোটা বই দিল। বইখানি ফিতে দিয়ে বাঁধা। ভিতর থেকে একখানি খামের খানিকটা বেরিয়ে আছে। কিংসফোর্ড মামলার কথা ভাবছিলেন, বইখানি আর খুললেন না, পাশেই রেখে দিলেন। যদি তিনি বইখানির

ফিতে খুলে চিঠি পড়ার জন্য খামখানি টেনে বের করতেন, তাহলেই তৎক্ষণাৎ তিনি প্রাণ হারাতেন। মোটা বইখানির পাতাগুলির মাঝখানটা কেটে একটি বাকস করা হয়েছিল, সেইখানে ছিল একটি বোমা, বইখানি খুললেই বোমাটি ফাটতো। কিন্তু সাহেবের বরাত জোর বলতে হবে, বইখানি বাড়ী নিয়ে গিয়ে, না খুলেই তিনি আলমারীর মধ্যে রেখে দিলেন।

ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট এলেন-সাহেবকে বিপ্লবীরা এবার গুলি মেরে জখম করলো।

কুষ্ঠিয়ার পাদ্রীসাহেব হেগেন বোথামের উপর গুলি চললো।

চন্দননগরের মেয়র মঁসিয়ে তার্দিভিল্ হাটখোলায় এক স্বদেশী সভা ভেঙ্গে দিয়েছিল; সন্ধ্যাবেলা তার শোবার ঘরে বিপ্লবীরা বোমা ছুঁড়ে মারলো, মেয়র তখন সে ঘরে ছিলেন না, বেঁচে গেলেন।

উপরওলারা কিংসফোর্ড সাহেবকে মাজিস্ট্রেট থেকে মজঃফরপুরের জজ করে দিলেন।

বিপ্লবীরা ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীকে পাঠালো মজঃফরপুরে। ক্ষুদিরাম নাম নিলেন দুর্গাদাস আর প্রফুল্ল নাম নিলেন দীনেশ রায়। দু'জনে এক ধর্মশালায় থেকে কিংসফোর্ডের গতিবিধির উপর নজর রাখতেন, এবং মাঝে মাঝে সাংকেতিক ভাষায় কলিকাতায় বারীনকে চিঠি লিখতেন:

'বরকে এখনও দেখতে পাইনি, কিন্তু বরের বাড়ীখানি ভালো করে লক্ষ্য করেছি, বরের বাড়ীখানি খারাপ নয়, আমি আপনাকে সবই জানাবো···ইত্যাদি।'

বর মানে কিংসফোর্ড সাহেব।

সাহেব রোজ রাত আটটার সময় ঘোড়ার গাড়ী চড়ে ক্লাব থেকে বাড়ী ফিরতেন। একদিন সন্ধ্যাবেলা ক্ষুদিরাম সেই গাড়ীতে বোমা ছুঁড়লেন। গাড়ীতে সাহেব ছিল না, ছিল ব্যারিস্টার কেনেডি সাহেবের মেম আর মেয়ে, তাঁরা দু'জনেই খুন হলেন। ক্ষুদিরাম আর সেখানে দাঁড়ালেন

না, দৌড় দিলেন। পাশে ছিলেন প্রফুল্ল, তিনিও আরেক দিকে দৌড়ালেন।

পরদিন ওয়াইনি স্টেশনের ধারে ক্ষুদিরাম খাবার কিনে খাচ্ছেন, তার দু'পকেটে ঝুলছে দুটি রিভলভার, এমন সময় দু'জন পুলিশ তাঁকে ধরে ফেললো। ক্ষুদিরামের পকেটে পাওয়া গেল ত্রিশটি টোটা আর তিনখানি দশটাকার নোট।

ওদিকে প্রফুল্ল ট্রেনে চেপে রওনা হোল মোকামা ঘাটের দিকে। তাঁকে দেখে দারোগা নন্দলাল বাঁড়ুয্যের কেমন যেন সন্দেহ হোল। সে পুলিশে জানালো। মোকামা-স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমেই প্রফুল্ল দেখে তাঁর চারি-পাশে পুলিশ। কিন্তু ধরা দেবার মত ছেলে সে নয়, পকেটে রিভলভার ছিল, সে আত্মহত্যা করলো।

কিংসফোর্ড সাহেবের এজলাসেই ক্ষুদিরামের বিচার হোল। পুলিশ অনেক চেষ্টা করলো, কিন্তু ক্ষুদিরামের মুখ থেকে বিশেষ কোন খবর তারা বের করতে পারলো না। রংপুর থেকে উকিল সতীশ চক্রবর্তী এলেন ক্ষুদিরামের মামলা লড়তে, কথায় কথায় একদিন জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার কোন রকম ভয় করছে না?

—ভয়?—ক্ষুদিরাম হাসতে হাসতে জবাব দিলেন—ভয় কিসের? আমি কি গীতা পড়িনি!…

ফাঁসীর আদেশ শুনে ক্ষুদিরাম জজকে বললেন—যদি আমাকে অনুমতি দেন তা হলে বোমা কেমন করে তৈরী করতে হয় তা সবাইকে শুনিয়ে যাই।

পুলিশ আদালত থেকে তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

ফাঁসীর মঞ্চে উঠেও ক্ষুদিরাম ভয় পাননি, দড়িতে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—ফাঁসীর দড়িতে এতো মোম দেওয়া হয়েছে কেন?

ক্ষুদিরামের কণ্ঠ হতে শেষ বাণী উচ্চারিত হয়েছিল—বন্দেমাতরম্!

ক্ষুদিরামের সৎকার হয় গণ্ডক নদীর তীরে।

প্রথম শহীদ হিসাবে ক্ষুদিরাম অমর হয়ে রইলেন বাঙালীর মনে, বাঙালা বাউলেরা দেশের পথে-ঘাটে গান ধরলো:

একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি—
শনিবার-দিন দশটা বেলা
হাইকোর্টেতে গেল জানা
ওমা, অবিরামের দীপ জ্বালনা—
ক্ষুদিরামের ফাঁসী—
ওমা, কলের বোমা তৈরী করে
দাঁড়িয়ে ছিলাম লাইনের ধারে
ওমা, বড়লাটকে মারতে গিয়ে
মারলাম ভারতবাসী—
হাতে যদি থাকতো ছোরা
তোর ক্ষুদি কি পড়তো ধরা
ওমা, রক্তে মাংসে এক করতাম
দেখতো ইংলণ্ড-বাসী
থাকতো যদি মা, টাটুঘোড়া
ক্ষুদিরাম কি পড়তো ধরা
ওমা, এক চাবুকে চলে যেতাম
গয়া গঙ্গা কাশী—
বেলা দশটা বেজে গেল
ফাঁসীর হুকুম জারী হোল
ওমা, হাসি-হাসি পরবো ফাঁসী
দেখুক ভারতবাসী—
দশমাস দশদিন পরে
জন্ম নিব খুড়ির ঘরে
চিনতে যদি না পারিস্ মা
গলায় দেখিস্ ফাঁসী
ওমা, মনের দুঃখ রইল মনে
আমার হোল না স্বদেশী—

কাঁচের বাসন কাঁচের চুড়ী
পর'না মা বিলিতী শাড়ী
এ মিনতি করি মাগো,
ভুলো না স্বদেশী—

বারীন ঘোষের আস্তানাই ছিল তখনকার বোমারুদের আড্ডা। গোড়ার দিকে আস্তানা বেশীদিন এক জায়গায় থাকতো না। প্রথমে বছর দেড়েক ছিল চাঁপাতলায়, তারপর ছ'মাস মানিকতলায়, তারপর দেওঘরে চারমাস, ভবানীপুরে দু'মাস, শ্যামবাজারে এক মাস, শেষে এলো মানিকতলায় এক বাগানবাড়ীতে। এই বাগানে যাঁরা থাকতেন তাঁদের আড়ম্বর ছিল না কিছুই, দু'বেলা নিজেরা রান্না করে খেতেন,—ভাত ডাল আর একটা তরকারী, কোন দিন বা ডালের মধ্যে দু'চারটে আলু ফেলে দিয়ে তরকারীর অভাবটা পূরণ করে নেওয়া হোত। কোন দিন-বা শুধুই খিচুরী। মাছ তেল লংকা পেঁয়াজ আশ্রমে নিষিদ্ধ। থালা ঘটি বাটী বিশেষ কিছুই ছিল না। প্রত্যেকের এক একটি মাটীর শান্‌কি আর একটি করে নারিকেলের মালা ছিল। খাওয়ার পর সেগুলি প্রত্যেককেই ধুয়ে-মুছে রাখতে হোত। নিজের কাপড় নিজেকেই সাবান দিয়ে কাচতে হোত। এখানে শেখানো হোত কি করে বোমা তৈরী করতে হয়। তার শিক্ষক ছিলেন হেমচন্দ্র কানুনগো। এই বিদ্যা শিখতে তিনি গিয়েছিলেন বিলাতে। ফ্রান্সে মাস কয়েক থেকে লুকিয়ে বোমা তৈরী করা শিখে আসেন। তাই তিনি শেখাতেন বোমা-আশ্রমের ছেলেদেরকে।

ক্ষুদিরামের ধরা পড়ার খবর এলো সন্ধ্যাবেলা, শ্রীঅরবিন্দ বারীনকে ডেকে বললেন—দলের সবাইকে সাবধান করে দাও, আড্ডা থেকে সবাইকে এখনি সরিয়ে দাও গে, জিনিষ-পত্রও যা পার সরিয়ে দাও।

বারীন কিন্তু কথাটার উপর তেমন গুরুত্ব দিলেন না।

পুলিশের কে একজন খবর দিল—সকালবেলা পুলিশ আসবে, সাবধান!

তবুও বারীন বিশেষ কিছুই করলেন না, কেবল বন্দুক, রিভলভার, গুলি, শেল প্রভৃতি কপি ক্ষেতে রেখে ছুটি-ছুটি মাটি চাপা দেবার ব্যবস্থা করলেন।

সেইদিন শেষরাত্রে পুলিশ মানিকতলার বাগান ঘিরে ফেললো। সেখান থেকে পাওয়া গেল রিভলভার, বন্দুক, রাইফেল, ডিনামাইট, ইলেকট্রিক ব্যাটারী, বোমার শেল ঢালাই করার যন্ত্রপাতি, বোমা তৈরী করার কয়েকখানি বই, আর গুপ্ত সমিতির কাগজপত্র। বাগানে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা শান্ত ছেলের মত পুলিশের হাতে ধরা দিলেন। কাগজপত্র দেখে যাদের নাম-ঠিকানা পাওয়া গেল তাদেরকেও পরে পুলিশ ধরলো, শ্রীঅরবিন্দও বাদ গেলেন না।

ধরা পরার পর বারীনের মন গেল বদলে। তিনি অপরাধ স্বীকার করলেন, বললেন—আমরা কি করতে চেয়েছিলাম দেশের লোককে তা জানিয়ে যাওয়া দরকার, আমরা জীবন দিচ্ছি না দেখলে এ মরণ-ভীতু জাত মরতে শিখবে না।

ইতিমধ্যে শ্রীরামপুরের নরেন গোঁসাই নিজেকে বাঁচাবার জন্য পুলিশের দিকে চলে গেল। দলের সবাই ক্ষেপে উঠলো। কৃষ্ণজীবন নামে একটি ছেলে একদিন সামান্য কারণে নরেনকে এক লাথি মারলো। জেলের কর্তারা জানতে পেরে নরেনের আলাদা থাকার ব্যবস্থা করলেন।

তবু নরেন রক্ষা পেলো না। কানাইলাল দত্ত একদিন পেটে হাত চাপা দিয়ে শূলবেদনার ভান করে ছটফট করতে লাগলেন। তাঁকে তখনই পাঠানো হোল হাসপাতালে। সত্যেন বসুর শ্বাসরোগ ছিল, তিনিও কদিন ধরে ছিলেন জেল-হাসপাতালে। কানাই আর সত্যেনে মতলব ঠিক করে ফেললেন। কে একজন আত্মীয় একদিন একটি কাঁঠাল দিয়ে গেল, তার মধ্যে ছিল রিভলভার। সত্যেন এবার রাজসাক্ষী হবার ভান করে নরেনের অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন, কথা হোল দলের বিরুদ্ধে একটি এজাহার তাঁরা লিখে দেবেন ছু'জনে মিলে।

সকাল বেলা নরেন এসে হাসপাতালে সত্যেনের সামনে বসে লিখতে

সুরু করেছে, সত্যেনের পকেটে ছিল রিভলভার, পকেটের ভিতর থেকেই ঘোড়া টিপ্‌লেন, কিন্তু গুলি বেরুলো না। এবার রিভলভার বের করে সত্যেন গুলি চালালেন। নরেনের সান্ত্রী ছিল পাশে, সে সত্যেনের কব্‌জি ধরে ফেললো। নরেন ততক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছে। কানাই ওদিকে ঘরের বাইরে দাঁত মাজার ভাণ করে পায়চারী করছিলেন, নরেনকে বেরুতে দেখে কানাই গুলি চালালেন। নরেনের পায়ে গুলি লাগলো, নরেন তবু দৌড়ালো। কানাই পিছনে তাড়া করলেন, সত্যেনও তখন বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। নরেনকে বেশীদূর পালাতে হোল না, কয়েকটি গুলি খেয়ে ঘুরে পড়ে গেল।

দুম্ দাম্ গুলির শব্দ শুনে জেলার, ডেপুটি জেলার, এসিস্ট্যাণ্ট জেলার, বড় জমাদার, ছোট জমাদার, অনেকেই আপিস ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল, কিন্তু সামনেই কানাইয়ের হাতে রিভলভার দেখে কে যে কোথায় পালাবে ঠিক করতে পারলো না। জেলার তো সবার আগে কারখানার এক বেঞ্চির নীচে গিয়ে লুকালো। শেষে কানাই আর সত্যেনের সব গুলি যখন ফুরিয়ে গেল, তখন সবাই এসে তাঁদেরকে ধরলো।

হাতকড়া পরাবার সময় সত্যেন বললেন—Is he quite dead?··· That's all!

শোনা যায় নরেনের মৃত্যুর খবর যেদিন প্রকাশিত হয়, সেদিন কলিকাতার পথে লোকে নৃত্য করেছিল। সুরেন্দ্রনাথ 'বেংগলী' অফিসের কর্মচারীদেরকে সন্দেশ খাইয়েছিলেন।

কানাই ও সত্যেন অপরাধ স্বীকার করলেন।

কোথা থেকে রিভলভার পেয়েছে জিজ্ঞাসা করতে কানাইলাল বলেন—ক্ষুদিরামের প্রেতাত্মা আমাকে রিভলভার দিয়ে গেছে।

দু'জনেরই ফাঁসীর হুকুম হোল। কানাইলাল আপীল করেননি, সত্যেনকে অনেক পীড়াপীড়ি করতে তিনি আপীল করলেন, তাঁর আপীলের

জবাবে বিলাত থেকে লর্ড মিণ্টো টেলিগ্রাম করলেন—আপীলের জন্য ফাঁসী বন্ধ থাকতে পারে না।

কানাইয়ের ফাঁসী হবার (১০ই নভেম্বর) তেরোদিন পরে সত্যেনেরও ফাঁসী হয়ে গেল (২৩শে নভেম্বর)।

ফাঁসীর আগে কানাইয়ের কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। ফাঁসীর হুকুম হবার পর তাঁর আট সের ওজন বেড়ে গিয়েছিল। আগের দিন সন্ধ্যায় হাসিমুখে দলের সবাইকার কাছ থেকে তিনি বিদায় নিয়ে যান।

তাঁর ফাঁসীর পর একজন য়ুরোপীয় প্রহরী চুপি চুপি বারীনকে জিজ্ঞাসা করেছিল—তোমাদের দলে এরকম ছেলে আর কতজন আছে?… এ রকম বীর যে দেশে জন্মেছে সে দেশ ধন্য। জন্মালে তো মরতেই হবে, এমন মরা ক'জন মরতে পারে?…চোখ ঢাকা দিয়ে যখন সে ফাঁসীর মঞ্চে উঠলো তখন সে হাসছে, হাসতে হাসতে আমাকে বললে—আমায় তুমি এখন কেমন দেখছ মিস্টার?

ফাঁসীর আগে সত্যেনের মা এসেছিলেন দেখা করতে। সত্যেন বলে পাঠালেন—মা যদি না কাঁদেন তবেই দেখা করবো, নচেৎ নয়।

মা তাতেই রাজী হলেন, সত্যেন মাকে বললেন—মা তোমার খুব কষ্ট হবে জানি, কিন্তু তীর্থে গেলে লোকে সবচেয়ে প্রিয় ফলটি ভগবানকে উৎসর্গ করে আসে…তুমি দেশের জন্য তোমার সবচেয়ে প্রিয় ছেলেকে দান করলে এই মনে করো, এই তোমার সান্ত্বনা।

সত্যেন ছাত্র হিসাবে খুব ভালো ছিলেন।

কালীঘাট শ্মশানে কানাইলালের সৎকার করা হয়। হাজার হাজার ছেলে সোনা-রূপা-হাতীর-দাঁতের কৌটা করে তাঁর চিতাভস্ম নিয়ে গিয়েছিল বাড়ীতে। তাই দেখে সত্যেনের মৃতদেহ জেলের বাইরে আনতে দেওয়া হয়নি। পরে কানাই আর সত্যেনের মূর্তি গড়ে ছেলেরা পূজা করেছিল।

যুগান্তর দলের মামলা চালালেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। তাঁর যুক্তির বলে ও বিতর্কের জোরে শ্রীঅরবিন্দ মুক্তি পেলেন, বারীন ঘোষ ও উল্লাসকর দত্তের ফাঁসীর হুকুম হয়েছিল, পরে হাইকোর্টের আপীলে তা রদ হয়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হোল, উপেন বাঁড়ুয্যে, হেমচন্দ্র কানুনগো, অবিনাশ ভট্টাচার্য, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল, ভূপেন দত্ত, দেবব্রত বসু, শৈলেন বসু প্রভৃতি পনেরো জনেরও দ্বীপান্তর হোল।

কিন্তু এতো করেও বোমা ছোড়া ও গুলি মারা বন্ধ হোল না। নন্দ বাঁড়ুয্যে নামে যে দারোগাটি প্রফুল্ল চাকীকে ধরিয়ে দিয়েছিল, কলিকাতার সার্পেনটাইন লেনে একটি ছেলে তাকে গুলি করে মারলো।

যুগান্তর দলের বিরুদ্ধে মামলা চালাচ্ছিলেন সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাস। একদিন আলিপুর পুলিশ কোর্টের মাঝেই চারু বসু নামে একটি ছেলে তাঁকে গুলি করে মারলো। চারুর ডান হাত ছিল পক্ষাঘাতগ্রস্ত, গুলি ছোড়ার সময় হাত কেঁপে পাছে তাক্ ভুল হয়ে যায় তাই রিভলভারটি সে হাতের কব্‌জির সঙ্গে বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল। চারু ধরা পড়লেন, তাঁর ফাঁসী হয়ে গেল।

মৌলবী সামশুল হক ছিলেন কলিকাতা পুলিশের একজন বড় গোয়েন্দা কর্মচারী। তিনি যুগান্তর দলের বোমার মামলার তদ্বির করেছিলেন। একদিন হাইকোর্টের সিঁড়ি দিয়ে তিনি নামছিলেন, বীরেন দত্তগুপ্ত পিছন থেকে তাঁকে গুলি করে মারলেন। বীরেন ধরা পড়লো, তাঁর ফাঁসী হোল।

যুগান্তর দলের কাণ্ড-কারখানা এখানেই মোটামুটি শেষ হোল বলা চলে।

এর পর ব্যাপক গোলমাল বাধালো গদরপার্টি।

দেশে দুর্ভিক্ষ অনাবৃষ্টি ও রোজগারের অসুবিধা হওয়ায় একদল শিখ কিছুদিন আগে এদেশ ছেড়ে চলে যায় ব্রহ্মদেশ, মালয়, সিংহপুর, হংকং, সাংহাই প্রভৃতি স্থানে। তাদেরই একটি দলে প্রায় হাজার পনেরো শিখ

ক্যানাডায় গিয়ে বসবাস সুরু করে। এদের সঙ্গে শীঘ্রই সেদেশের লোকদের প্রতিযোগিতা সুরু হয়ে যায়। তখন বিদেশী হিসাবে এদেরকে অনেক নির্যাতন সইতে হয়। আর যেন শিখেরা সেদেশে না যেতে পারে, সেইজন্য সেখানকার গবর্মেণ্টও একটা আইন করে দেয়। এই আইনের বিরুদ্ধে শিখেরা আন্দোলন সুরু করলো, তারা একখানি কাগজ বের করলো—'গদর'। উর্দু, হিন্দি, মারাঠী ও গুরুমুখী ভাষায় এই কাগজখানি ছাপা হোত। এই কাগজখানি চালাতেন লালা হরদয়াল আর তাঁর সঙ্গে ছিলেন সোহন সিংহ ভাখ্‌না, রামচন্দ্র পেশোয়ারী ও বরকতুল্লা। অল্পদিনের মধ্যেই ক্যানাডায় গদর দলের বাহাত্তরটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। আর্জেণ্টাইন, জাপান, ফিলিপাইন, ফিজি, চীন ও মালয়েও শাখা ছড়িয়ে পড়ে। হরদয়ালকে ক্যানাডা গবর্মেণ্ট গ্রেপ্তার করে। জামিনে খালাস পেয়েই হরদয়াল ইউরোপে পালিয়ে যান।

ইতিমধ্যে শিখেরা ক্যানাডার আইনের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য তৈরী হোল। বাবা গুরুদিৎ সিং ঠিক করলেন একখানি জাহাজ ভাড়া করে একদল শিখকে তিনি নিয়ে যাবেন ক্যানাডায়, দেখা যাবে সেখানে আইনের দৌড় কতদূর পৌঁছায়। কিন্তু এদেশের কোন জাহাজ যেতে রাজী হোল না। শেষে হংকং থেকে একখানি জাপানী জাহাজ ভাড়া করা হোল—কোমাগাটা মারু। চারশো যাত্রী নিয়ে পঞ্চাশ দিন সাগরে পাড়ি জমিয়ে জাহাজখানি বরাবর এসে লাগলো ক্যানাডার ভাংকুভার বন্দরে। বন্দরের পুলিশ বললো—নামা চলবে না।

শিখেরা ক্ষেপে উঠলো, পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষ বেধে গেল। পুলিশ হটে গেল। তখন কয়েকখানি রণতরী এসে জাহাজখানি ঘিরে ফেললো, বললো—এখনি বন্দর ছাড়ো, নইলে কামান দেগে জাহাজ ডুবিয়ে দোব।

কোমাগাটা মারু নোঙর তুলতে বাধ্য হোল।

ফেরার পথে যাত্রীরা বললো—হংকংএ নামবো।

কেউ বললো—সিংহপুরে নামবো।

কিন্তু ইংরেজরা নামতে দিল না।

দু'মাস পরে জাহাজখানি ফিরে এল ডায়মণ্ড-হারবারে। শিখেরা জাহাজ থেকে নেমে কলিকাতার দিকে পা বাড়ালো। পুলিশ পথ আটকালো, বললো—ট্রেন তৈরী আছে, পাঞ্জাবে চল।

শিখেরা বললো—আমাদের যেখানে খুসি যাব, তোমাদের কি?

পুলিশ বললো—জোর করে ট্রেনে তুলে দোব।

শিখেরা বললো—উত্তম, আমরাও তৈরী।

সংঘর্ষ বেধে গেল। আঠারো জন শিখ ও জন কয়েক পুলিশ হত হোল। সেই গোলমালের মধ্যে ২৯ জন সঙ্গীকে নিয়ে বাবা গুরুদিৎ সিং নিরুদ্দেশ হলেন।

খবরটা পাঞ্জাবে এসে পৌঁছালো, শিখেরা ক্ষেপে উঠলো। পিরোজপুরে পুলিশের সঙ্গে বিপ্লবীদের সংঘর্ষ হোল। চৌকিমান স্টেশন বিপ্লবীরা লুঠ করলো। কর্তার সিং সারোভা নামে একজন শিখ ভারতীয় সৈনিকদের মাঝে বিপ্লবের মন্ত্র ছড়িয়ে দিলেন। তাঁর সঙ্গে কাজ করছিলেন রাসবিহারী বসু, বিষ্ণু পিংলে, জগৎরাম ও ভাই-পরমানন্দ। মীরাট, লখ্‌নৌ, ফৈজাবাদ, কানপুর, এলাহাবাদ, জব্বলপুর, লাহোর, রাওয়ালপিণ্ডি, ঢাকা,—সর্বত্রই সৈন্যরা বিদ্রোহ করার জন্য তৈরী হোল। লাহোরে বিপ্লবীদের প্রধান ঘাঁটি হোল। রাসবিহারী বসু সংগ্রাম পদ্ধতির খসড়া তৈরী করে ফেললেন। বিদ্রোহীদের পতাকা, ইউনিফর্ম ও প্রতীক তৈরী হোল। অস্ত্র আমদানী ও সরবরাহের ব্যবস্থা হোল। বিদ্রোহ ঘোষণার তারিখও ঠিক হয়ে গেল।

কিন্তু যে ভাবেই হোক পুলিশ আগেই জানতে পেরেছিল। কর্তার সিং, বিষ্ণু পিংলে ও জগৎরাম ধরা পড়ে গেল। রাসবিহারী পালিয়ে গেলেন। ২৮ জন বিপ্লবীর প্রাণদণ্ড হোল।

যুগান্তর দল তো গেল, কিন্তু বাংলার বিপ্লবীরা নিঃশেষ হোল না। 'অনুশীলন সমিতি' পুলিনবিহারী দাসের নেতৃত্বে শাখা-প্রশাখা নিয়ে ছড়িয়ে পড়লো সর্বত্র। শুধু ঢাকা জেলাতেই তখন তাদের ৫০০ শাখা। কাজ

চালাবার জন্য টাকার দরকার হলেই তারা ডাকাতি করতো। একে একে অনেক জায়গাতেই স্বদেশী ডাকাত হানা দিল—রাজেন্দ্রপুর (যশোহর)··· হলুদবাড়ী (নদীয়া)···ময়মনসিং···হুগলী···। পুলিশ যাদেরকে ধরতে পারলো, তাদের কাউকে পাঠালো দ্বীপান্তরে, কেউ গেল জেল খাটতে।

গুলিও চললো। বরিশালের পুলিশ ইনেস্‌পেক্‌টার মনোমোহন ঘোষ খুন হোল। ময়মনসিংহে রাজকুমার ও বঙ্কিম চৌধুরী গুলিতে মরলো। মৌলবীবাজারে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট গর্ডন অল্পের অন্য বেঁচে গেলেন।

ঢাকার সোনারং ইস্কুলের চৌদ্দ জন ছাত্র ও শিক্ষককে জড়িয়ে পুলিশ এক ষড়যন্ত্র মামলা করলো। সেই মামলায় সরকারী পক্ষে সাক্ষী ছিল তিন জন, সে তিনজনই বিপ্লবীদের হাতে প্রাণ হারালো। পুলিন দাসের সাত বছর জেল হোল।

কিছুদিনের মধ্যেই সরকার ভাঙা বাংলাকে আবার এক করলেন।

কিন্তু বিপ্লবীরা এতে শান্ত হলেন না, স্বাধীনতার স্বপ্ন তাঁদের চোখে। যতীন মুখোপাধ্যায়কে নেতা মেনে নিয়ে তাঁরা সবাই একত্র হলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন—বরিশালের স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, নরেন ঘোষ, মনোরঞ্জন গুপ্ত, ময়মনসিংয়ের হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য, সুরেন ঘোষ, মাদারীপুরের পূর্ণচন্দ্র দাস, উত্তর বঙ্গের যতীন রায়, যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, যোগেন দে সরকার, খুলনার সতীশ চক্রবর্তী, যশোরের বিজয় রায়, তাছাড়া নরেন ভট্টাচার্য, বিপিন গঙ্গোপাধ্যায়, ও অনুকূল মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন।

যতীন মুখুজ্জে এলোমেলো গুলি ছোঁড়ার বিরোধী ছিলেন। ব্যাপক ভাবে দেশব্যাপী বিদ্রোহ করার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করছিলেন অস্ত্র সংগ্রহের দিকে।

রডা কোম্পানি তখনকার দিনে ছিলেন কলিকাতার নাম-করা অস্ত্র ব্যবসায়ী। বিলাত থেকে তাদের জন্য ২০২ বাক্‌স গুলিবারুদ অস্ত্রশস্ত্র এসে পৌঁছালো কাস্টমস্‌-হাউসে। কোম্পানি একজন কেরানীকে

পাঠালো মালগুলো নিয়ে আসার জন্য। লোকটিকে দেখতে ছিল বেজায় নিরীহ, কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন বিপ্লবী দলের একজন সদস্য। ১৯২ বাক্স মাল আপিসে পৌঁছে দিয়ে বাকী ১০ বাক্স মাল নিয়ে সে কোথায় উধাও হোল। বিপ্লবীদের হাতে এসে পড়লো ৫০টি মসার পিস্তল, আর ৪৬০০০ বুলেট। বিপিন গাঙ্গুলি সেগুলি দলের সকলের মাঝে ভাগ করে দিলেন।

এই অস্ত্রগুলি বিপ্লবীরা কাজে লাগালো পুলিশ আর দুষ্ট লোকদের শায়েস্তা করতে। বিপ্লবীদের নীতি ছিল—অত্যাচারী, সুদখোর মহাজন অথবা বিদেশী ব্যবসায়ীদের টাকা লুঠ করে এনে দেশের কাজে লাগানো। তাছাড়া দলের ছেলেদের খাওয়া-পরা, থাকা ও দেশবিদেশে ঘোরার জন্য টাকার প্রয়োজন, ডাকাতি ছাড়া অতো টাকা আসবে কোত্থেকে। অল্প দিনের মধ্যেই হাজার হাজার টাকা এসে পড়লো ডাকাত ছেলেদের হাতে।

পুলিশের উৎপাত যখনই বেশী হোত তখনই দলের ছেলেরা গুলি চালাতো। তাছাড়া সারা ভারতব্যাপী বিপ্লব সংঘটন করতে হলে নির্মম না হলে চলে না,—হয় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে ফাঁসী যেতে হবে, না হয় পুলিশকে মেরে সরে পড়তে হবে। পুলিশকে কিছুটা সন্ত্রস্ত করে রাখাও দরকার। বছর দুয়েক ধরে বোমা ফাটলো আর গুলি চললো কয়েক জায়গায়।

বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ হাতীর পিঠে চড়ে দিল্লীর দরবারে যাচ্ছিলেন, পথে রাসবিহারী বসু তাঁর উপর বোমা ছুড়লেন। হাতীটি আহত হোল, বড়লাট বেঁচে গেলেন। পুলিশ রাসবিহারীকে ধরতে পারলো না···বছর খানেক পরেই কলিকাতার গোলদিঘির ধারে হেড কনস্টেবল হরিপদ দেবকে তিনজন বিপ্লবী গুলি করে মারলো···গোয়েন্দা-ইনেস্‌পেক্‌টার নৃপেন ঘোষ চীৎপুরে গ্রে স্ট্রীটের মোড়ে ট্রাম থেকে নামবার সময় নির্মল রায়ের গুলিতে নিহত হলেন। পালাবার সময় অনন্ত তেলী নামে একটা ছেলে নির্মলের গায়ের আলোয়ান চেপে ধরলো, নির্মল তাকেও গুলি করলো। কিন্তু পরক্ষণেই রিভলভার শুদ্ধ নির্মল ধরা পড়ে গেল,

কিন্তু বিচারে নির্দোষ বলে সে খালাস পেলে।...পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেণ্ডেণ্ট বসন্ত চাটুজ্যের বাড়ীতে বিপ্লবীরা বোমা ফেললে, তাতে একজন হেড কনস্টেবল্ ও দু'জন পুলিশ আহত হয়।...১৯১৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনের সময় ইনেস্‌পেক্‌টার সুরেশ মুখুজ্যে হঠাৎ পথে একটি ছেলেকে দেখে চমকে উঠলো,—সে চিত্তপ্রিয় চৌধুরী। কিছুদিন আগে একজন গুপ্তচরকে গুলি করে সে গা ঢাকা দিয়েছিল। সুরেশ চিত্তকে ধরার জন্য এগিয়ে এলেন। চিত্তের পিছনে ছিলেন আরো চারজন বিপ্লবী, তারা সুরেশ মুখুজ্যেকে সেখানেই গুলি করে মারলো।

ইতিমধ্যে জার্মান যুদ্ধ সুরু হয়ে গেছে। ইংরেজকে তাড়াতে হলে ইংরেজের শত্রুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে ভারতের বাইরে বিপ্লবীরা দুটি ঘাঁটি করলেন—যবদ্বীপের বাটাভিয়ায় আর শ্যামরাজ্যের বাংককে। লালা হরদয়াল ক্যানাডা থেকে পালিয়ে জার্মানিতে যান, সেখানে চম্পক রমণ পিলে, তারকনাথ দাস, চন্দ্রকুমার চক্রবর্তী ও হেমন্তলাল গুপ্তের সঙ্গে একত্র হয়ে 'ইণ্ডিয়ান্ ন্যাশন্যাল পার্টি' প্রতিষ্ঠা করলেন। এই সঙ্গে আমেরিকা ও ইউরোপের যোগাযোগ রাখছিলেন বীরেন চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন দত্ত ও বীরেন সরকার। দলের দু'জন সদস্য সত্যেন সেন ও বিষ্ণু পিংলে আমেরিকা ঘুরে কলিকাতায় এসে পৌঁছলেন। যতীন মুখুজ্যের দলের সঙ্গে তাঁদের পাকা কথা হয়ে গেল—কি ভাবে জার্মানি থেকে ভারতীয় বিপ্লবীদের জন্য অস্ত্র আসবে।

রীতিমত লড়াইয়ের জন্য এখানে বিপ্লব-বাহিনী তৈরী হতে লাগলো—অশ্বারোহী বাহিনী, পদাতিক বাহিনী, সিগ্‌ন্যালিং বাহিনী। ভারতের জনগণের মনে বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে তিনজন বিপ্লবী তিনদিকের ভার নিলেন—পূর্ব ভারতে যতীন মুখুজ্যে, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও উত্তর ভারতে রাসবিহারী বসু, আর এদেশী সিপাহীদেরকে দলে টানার কাজ নিলেন শচীন সান্ন্যাল।

অস্ত্র আনার জন্য নরেন ভট্টাচার্য গেলেন বাটাভিয়ায়। সেখানে

তাঁর নাম হোল সি. মার্টিন। জার্মান কনসালের সঙ্গে পরামর্শ করে এক জাহাজ গোলাগুলি বন্দুক নিয়ে দেশের দিকে যাত্রা করলেন। জাহাজে ছিল দু'লাখ টাকা, ত্রিশ হাজার রাইফেল আর প্রত্যেকটি রাইফেল ৪০০ বার ছোড়ার মত উপকরণ। কথা ছিল সুন্দরবনের রায়মঙ্গলে এই জাহাজ এসে লাগবে, মাল নামাবার ব্যবস্থা করবেন যদুগোপাল মুখুজ্যে, অস্ত্র পাবার পরেই বিপ্লবীরা বাংলায় বিদ্রোহ ঘোষণা করবেন। তখন ভারতের আর কোথাও থেকে যাতে বাংলাদেশে সৈন্য না আসতে পারে তার ব্যবস্থা হবে—যতীন মুখুজ্যে মাদ্রাজ রেলপথ উড়িয়ে দেবেন, ভোলানাথ চাটুজ্যে চক্রধরপুরে বি-এন-আর লাইন উড়িয়ে দেবেন, আর সতীশ চক্রবর্তী অজয় নদের সেতু উড়িয়ে দেবেন। ইতিমধ্যে নরেন চৌধুরী ও ফণী চক্রবর্তী পূর্ববঙ্গ দখল করবেন। নরেন ভট্টাচার্য ও বিপিন গাঙ্গুলি কলিকাতার চারিপাশের অস্ত্রাগার দখল করে ফোর্ট উইলিয়ম অধিকার করবেন।

জার্মান জাহাজ কিন্তু পথে ধরা পড়ে গেল। এই ধরা পড়ার মূলে ছিল চেকোশ্লোভাকিয়ার বিপ্লবীরা। ইউরোপে চেকেরা ছিল জার্মানদের অধীন। যুদ্ধের সময় তারা দেশের স্বাধীনতা ফিরে পাবার চেষ্টা করে। সেই উদ্দেশ্যে জার্মানদের শত্রু ইংরেজ, ফরাসী ও মার্কিনকে তারা খুসি রাখতে চায়। ইংরেজদের খুসি করার জন্য তারা ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে মেলামেশা করতো, সব খোঁজখবর রাখতো এবং নূতন কোন খবর পেলেই ফরাসী ও মার্কিন কনসাল মারফৎ ইংরেজদেরকে জানিয়ে দিত। তাদের মারফতেই এই জার্মান জাহাজের খবর আগে থাকতেই ভারত গবর্মেণ্ট জানতে পেরেছিল। ভারতে অস্ত্র নিয়ে আসার পথে পর পর তিনখানি জার্মান জাহাজ ধরা পড়ে গেল।

জাহাজ আসে না, হোল কি? ভোলানাথ চাটুজ্যে গেলেন গোয়াতে, পুলিশ তাঁকে ধরে ফেললো। পুণা জেলে তিনি আত্মহত্যা করলেন। ভূপতি মজুমদার গেলেন চীনে, সিংহপুরে তাঁকে পুলিশ ধরলো। অবনী মুখুজ্যে জাপান থেকে ফেরার পথে ধরা পড়লেন। হেরম্ব গুপ্তকে

পুলিশ ধরলো আমেরিকাতে। এখানেও বিপ্লবীদের ছুটি আড্ডা পুলিশ ভেঙ্গে দিল—'হ্যারি এণ্ড সন্সের' মালিক হরিকুমার চক্রবর্তী ও 'শ্রমজীবী সমবায়ের' অমর চাটুজ্যেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলো। রাসবিহারী বসু ও যদুগোপাল মুখুজ্যেকে শত চেষ্টা করেও পুলিশ ধরতে পারলো না।

অস্ত্র আনার চেষ্টা তখনও বন্ধ হয়নি, দু'জন চীনাকে ঠিক করা হোল, তারা নৌকার কাঠের তক্তার নীচে ১২৯টী অটোমেটিক পিস্তল ও ২০৮৩০ রাউণ্ড গুলি-বারুদ লুকিয়ে আনছিল, সংহাইয়ে তারাও ধরা পড়ে গেল।

দলের নায়ক যতীন মুখুজ্যেকে পুলিশ খুঁজছে, এমন সময় খবর এলো ময়ূরভঞ্জের পার্বত্য অঞ্চলে তাঁকে দেখা গেছে। কলিকাতার পুলিশ-কমিশনার স্যার চার্লস টেগার্ট একদল অশ্বারোহী নিয়ে তখনই ছুটলেন। বালেশ্বর থেকে কুড়ি মাইল দূরে কোপ্‌দিপোতার জঙ্গলে যতীনের সঙ্গে টেগার্টের মুখোমুখি দেখা হোল। যতীন ট্রেঞ্চ খুঁড়ে অপেক্ষা করছিলেন। সঙ্গা ছিলেন চারজন—চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, নীরেন দাসগুপ্ত ও জ্যোতিষ পাল।

লড়াই সুরু হয়ে গেল, চিত্তপ্রিয় গুলিতে নিহত হলেন। যতীন পেটে গুলি লেগে সাংঘাতিক ভাবে আহত হলেন। গুলি ফুরিয়ে যেতে নীরেন, জ্যোতিষ ও মনোরঞ্জন ধরা পড়লো। আহত যতীনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হোল। বড় তৃষ্ণা, যতীন জল চাইলেন। টেগার্ট সাহেব পাশেই ছিলেন, তাঁকে এক গ্লাস জল এগিয়ে দিলেন, যতীন সে জল নিলেন না, বললেন—যার আমি রক্ত দেখতে চেয়েছিলাম তার দেওয়া জলে আমি তৃষ্ণা মেটাতে চাই না।

বালেশ্বর হাসপাতালে যতীন মারা গেলেন।

টেগার্ট সাহেব বললেন—আমি আমার কর্তব্য করেছি, কিন্তু যতীনকে আমি শ্রদ্ধা করি, তিনিই একমাত্র বাঙালী-বিপ্লবী যিনি ট্রেঞ্চে যুদ্ধ করে মরেছেন।

নীরেন ও মনোরঞ্জনের ফাঁসী হোল। জ্যোতিষ আন্দামান জেলের খাটুনি ও অত্যাচারে পাগল হয়ে মারা যান।

এই সময় কাবুল থেকে আর-একদল বিপ্লবী দেশ স্বাধীন করার চেষ্টা করছিলেন। এঁদের দলে ছিলেন রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, বরকতুল্লা, ওবেদুল্লা, মৌলানা মামুদ হাসান, মৌলানা মোহম্মদ আলি, শওকৎ আলি, আবুল কালাম আজাদ, মৌলানা জাফর আলি প্রভৃতি। তুর্কীরা তখন ইংরেজদের শত্রু, তাদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে এঁরা ভারত আক্রমণ করার উদ্যোগ করলেন। সীমান্তে যখন লড়াই হবে ভারতের ভিতরে মুসলমানরা তখন যেন বিদ্রোহ করে সেই ব্যবস্থা করা হোল। তারপর এদেশে অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা করে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপকে করা হবে তার রাষ্ট্রপতি। এই সম্পর্কে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টায় জার্মানি, ইটালি, ফ্রান্স, সুইট্জারল্যাণ্ড প্রভৃতি ঘুরে আসেন, জার্মান সম্রাট কাইজারের সঙ্গেও তাঁর আলাপ-আলোচনা হয়।

গুপ্তচরদের দৃষ্টি এড়াবার জন্য এঁরা চিঠি লিখতেন রেশমী রুমালের উপর, কি ভাবে কে জানে কয়েকখানি চিঠি এসে পড়লো ইংরেজদের হাতে, ইংরেজরা সাবধান হয়ে গেল। বিপ্লবীদের সাহায্য করেছিলেন মক্কার শেরিফ, গতিক সুবিধার নয় দেখে তিনি এবার ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দিলেন—'রেশমী রুমাল ষড়যন্ত্র' ফেঁসে গেল। মহেন্দ্রপ্রতাপ চলে গেলেন জাপানে।

যুদ্ধের পর গান্ধীজী যে অসহযোগ আন্দোলন সুরু করেন অনেক বিপ্লবী তাতে যোগ দেন, কিন্তু চোরীচৌরা থানা জ্বালিয়ে দেবার পরে গান্ধীজী যে ভাবে আন্দোলন বন্ধ করে দেন বিপ্লবীদের তা পছন্দ হয়নি। যোগেশ চাটুজ্যে, শচীন সান্ন্যাল প্রভৃতি আবার দল গড়তে চেষ্টা করলেন। টাকার চেষ্টায় বিপ্লবীরা আবার ডাকাতি সুরু করলো।

শাঁখারীটোলা পোস্টাপিস লুট করতে গিয়ে বরেন ঘোষ ধরা পড়লেন, তাঁর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হোল। চৌরঙ্গীতে টেগার্ট সাহেবকে মারতে গিয়ে গোপীনাথ সাহা ভুল করে কিলবার্ণ কোম্পানির ডে-সাহেবকে গুলি করে মারলেন। গোপীনাথের ফাঁসী হয়ে গেল।

১৯২৫ সালে লখ্নৌ-সাহারাণপুর লাইনে কাকোরী স্টেশনে একখানি মেল-ট্রেনে ডাকাতি হয়ে গেল। এক দুর্যোগের রাত্রে গাড়ীখানি সবেমাত্র স্টেশন ছাড়িয়েছে, এমন সময় কে যেন 'চেন' টেনে গাড়ী থামিয়ে দিল, পরক্ষণেই ট্রেন থেকে নামলো একদল পিস্তল-ধারী যুবক, গার্ড ও ড্রাইভারকে ভয় দেখিয়ে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে মেল-ভ্যানের সমস্ত টাকার থলি নিয়ে উধাও হয়ে গেল। একমাস খোঁজ খবর নিয়ে পরে পুলিশ একে একে অনেককে গ্রেপ্তার করলো।

তিনমাস পরে পুলিশ আবিষ্কার করলো দক্ষিণেশ্বরে এক বোমার কারখানা, সেখানে বিপ্লবী ছেলেদেরকে বোমা তৈরী ও রিভলভার ছোড়া শেখানো হোত। এই সম্পর্কে কালকাতা, বহরমপুর, কাশী, এলাহাবাদ, লখ্নৌ, আগ্রা, কানপুর, সাজাহানপুর প্রভৃতি স্থান থেকে অনেককে পুলিশ ধরে। এঁদের মুখ থেকে গোপন কথা বের করার জন্য গোয়েন্দা পুলশের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট রায় বাহাদুর ভূপেন চাটুজ্যে মাঝে মাঝে হাজতে এসে এঁদের সঙ্গে কথাবার্তা কইতেন। একদিন জেলের মধ্যে বিপ্লবীরা তাঁকে খুন করলো। এই সম্পর্কে অনন্তহরি মিত্র ও প্রমোদ চৌধুরীর ফাঁসী হয়ে গেল।

একবছর আটমাস মামলা চললো। শেষে রাজেন লাহিড়ী, রোশন সিং, রামপ্রসাদ বিসমিল ও আসফাক্উল্লার ফাঁসি হোল এবং শচীন সান্ন্যালের যাবজ্জাবন দ্বীপান্তর, মন্মথ গুপ্তের ১৪ বছর, যোগেশ চাটুজ্যে ও আরো চার্ জনের ১০ বছর এবং আর সাত জনের পাঁচ-বছর করে জেল হলো।

কাকোরী মামলার হিসাব নিকাশ করে (৬ এপ্রিল ১৯৩৭) বছর খানেক যেতে না যেতেই আরেকদল বিপ্লবী গজিয়ে উঠলো। দিল্লীর পরিষদ-কক্ষে সভা চলছে এমন সময় উপরে দর্শকদের গ্যালারি থেকে পড়লো এক বোমা,—বুম্ম্! ক'জন সদস্য সামান্য আহত হলেন, দুটী যুবককে পুলিশ ধরলো—ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত।

আদালতে ভগৎ সিং কৈফিয়ৎ দিলেন—এদেশের গরীব মজুরদের বহু কষ্টের পয়সা দিয়ে আড়ম্বরপূর্ণ বিরাট প্রাসাদ তৈরী করা হয়েছে। অনেক চেষ্টা করেও আমরা এর কোন প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারিনি, এটা একটা মস্ত ফাঁকী মাত্র। এই ফাঁকীবাজী ধ্বংস করতেই আমরা পরিষদে বোমা ফেলেছি।

ছ'জনকে জেলে পাঠিয়ে পুলিশ সবেমাত্র স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে, এমন সময় লাহোরের সহকারী পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ও একজন পুলিশ বিপ্লবীদের হাতে খুন হোল। দেখতে দেখতে পুলিশ এক বিরাট ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করে ফেললো—কতজনকে ধরলো, ভগৎ সিংয়ের আবার নতুন করে বিচার হোল। তিনজনের ফাঁসী হোল—ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেও। যতীন দাসও এঁদের সঙ্গে ধরা পড়েন। জেলের মধ্যে অসামীদের উপর যে সব অনাচার হোত, তা সইতে না পেরে যতীন অনশন সুরু করলেন এবং একাদিক্রমে ৬৩ দিন উপবাস করে দেহত্যাগ করলেন।

এই লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ভগৎ সিংয়ের ফাঁসী নিয়ে ভারতব্যাপী অসন্তোষ দেখা দিল। ফাঁসীর আগে সরকার মেমসাহেবদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন—যেন অন্ততঃ দিনদশেক কেউ পথে না বের হয়। গান্ধীজী এঁদের বাঁচাবার অনেক চেষ্টা করেন, বড়লাট কিন্তু গান্ধীজীর কথা রাখেন নি। ভারতের বিপ্লববাদী যুবকেরা গান্ধীজীর উপর ক্ষেপে ওঠেন এবং করাচি স্টেশনে গান্ধীজীকে কালো নিশান দেখিয়ে ও কালো ফুল উপহার দিয়ে বিক্ষোভ প্রকাশ করেন। ওদিকে বড়লাট লর্ড আরুইনের প্রাণনাশেরও চেষ্টা হয়। লাইনের উপর বোমা রেখে ট্রেন উড়িয়ে দেওয়া হয়, বড়লাট অল্পের জন্য বেঁচে যান, দু'জন আরদালী জখম হয়।

ইতিমধ্যে পুলিশ কলিকাতার মেছুয়াবাজারে একটি বোমা তৈরীর কারখানা আবিষ্কার করে, তাতে আবার ক'জন যুবকের দ্বীপান্তর হয়।

এই সময় দক্ষিণ ভারতে আরেকদল বিপ্লবী দেখা দিল, এঁদের নেতা ছিলেন শ্রীরাম রাজু। তাঁরা পুলিশের থানা লুঠ করেন, বন্দুক ও কার্তুজ

যোগাড় করেন, এবং ছ'বার পুলিশের সঙ্গে লড়াই করে শেষে পরাজিত হন। শ্রীরাম রাজু পুলিশের হাতেই নিহত হন।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার মাস চারেক পরেই একদল সশস্ত্র বিপ্লবী চট্টগ্রাম শহরটা প্রায় দখল করে বসলেন। এই দলের নেতা ছিলেন সূর্য সেন ও অম্বিকা চক্রবর্তী। এঁদের আদর্শ ছিল সমগ্র ভারতে না হোক, অন্ততঃ তার একটা অংশেও—শুধু চট্টগ্রামে কয়েক দিনের জন্যও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা। সেজন্য তাঁরা আগে থেকেই নিজেদেরকে পুরোদস্তুর সৈনিক করে গড়ে তুলেছিলেন। এঁদের গুপ্তচরও ছিল।

১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল রাত আটটার সময় একখানি ট্যাক্সি এসে থামলো চট্টগ্রামের শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে পাহাড়তলিতে। আরোহী ছিলেন আটজন সৈনিক-বেশী বিপ্লবী। সামনেই রেলওয়ে অস্ত্রাগার। বরাবর মোটার এসে ঢুকলো অস্ত্রাগারের ভিতরে।

পাহারাদার হাঁকলো—হুকুমদার?

বিপ্লবী সৈনিকেরা উত্তর দিলেন—বন্ধু!

গাড়ী থেকে নামতেই প্রহরী সেলাম দিল, একজন সৈনিক বললেন—আমরা স্বদেশী সৈনিক, তোমরা এখান থেকে চলে যাও।

কিন্তু প্রহরীরা পালালো না, রুখে দাঁড়ালো। তারা কিছু করার আগেই বিপ্লবীরা গুলি চালালো। একজন আহত হতেই বাকী তিনজন প্রহরী দৌড় দিল। এদিকে শব্দ শুনেই উপরের বারান্দায় সার্জেন্ট মেজর ফ্যারেল বেরিয়ে এলেন, জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়েছে?

নীচে থেকে উত্তর হোল—আমরা ভারতীয় গণতন্ত্রী সেনা এই অস্ত্রাগার দখল করেছি। তুমি আমাদের কোন অনিষ্ট করার চেষ্টা করলে তোমার মৃত্যু নিশ্চিত!

—বটে!—সাহেব রিভলভার তুললেন।

তৎক্ষণাৎ বিপ্লবীদের গুলি খেয়ে তিনি ধরাশায়ী হলেন।

মেম সাহেব ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন। চমকে উঠলেন,

ছেলেটীকে বুকের মাঝে চেপে ধরে মিনতি করলেন—এ দুধের বাছা, কিছুই জানে না, একে কিছু বল না—প্রাণ ভিক্ষা চাইছি।

বিপ্লবীরা বললেন—আপনার কোন ভয় নেই, কেউ আপনার কোন অনিষ্ট করবে না, আপনি আমাদের মা।

রেলওয়ে অস্ত্রাগার বিপ্লবীরা লুঠ করলেন।

রাত দশটার সময় আরেকখানি ট্যাক্‌সি গিয়ে থামলো আরেক টিলায় —পুলিশ-অস্ত্রাগারের সামনে। বিপ্লবীরা ছিলেন সৈনিকের পোষাকে। মোটর থেকে নেমেই তাঁরা গুলি চালাতে সুরু করলের। একজন প্রহরী আহত হোল, বাকী সবাই পালালো। পাঁচশো পুলিশ থাকতো সেখানে, গুলির আওয়াজ পেয়ে কে যে কোথা দিয়ে সরে পড়লো অন্ধকারে তা বের করা গেল না, অনায়াসে পুলিশ-অস্ত্রাগার দখল হয়ে গেল।

ঠিক সেই একই সময় টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন আপিস আক্রমণ করলেন অম্বিকা চক্রবর্তী। পিস্তল দেখেই তো অপারেটার বেচারা কেঁপে উঠলো। সুপারিনটেণ্ডেণ্ট পালিয়ে গেল। বিপ্লবীরা ভেঙে-চুরে টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ লাইন অচল করে দিলেন।

আরেকদল বাহির হয়ে গিয়েছিলেন দু'দিন আগে, ১৮ই এপ্রিল ঠিক রাত দশটার সময় তাঁরা ধুম ও লাংগলকোটের কাছে রেললাইন উপড়ে ফেললেন।

সমগ্র চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের করায়ত্ত হোল। পুলিশ-অস্ত্রাগারের চারিদিকে আলোর সিগন্যাল দেওয়া হোল, সমস্ত বিপ্লবীরা এসে সমবেত হলেন সেখানে। সেখানেই ভারতের 'স্বাধীন সাময়িক বিপ্লবী সরকার' গঠিত হোল, মাস্টারদা' সূর্য সেন হলেন তার রাষ্ট্রপতি।

অস্ত্রাগারের সামনেই ছিল জল-কল (ওয়াটার ওয়ার্কস্)। রাত দুটোর সময় সেখান থেকে পুলিশ মেশিনগান চার্জ করলো। বিপ্লবীরা ভোরের আগেই সেখান থেকে সরে গেলেন, তবে যাবার আগে পুলিশ হেড-কোয়ার্টাসে, আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেলেন।

সকালবেলা সাহেবদের মধ্যে হৈচৈ বেধে গেল। বন্দরে একখানি

জাহাজ ছিল, ম্যাজিস্ট্রেট যত সাহেব-মেমকে নিয়ে গিয়ে উঠলেন সেই জাহাজে। জাহাজখানি নদীর মাঝে নোঙর করে রইল, যেন বিপ্লবীরা সহসা তাদেরকে আক্রমণ করতে না পারে।

তিনদিন ইংরেজ প্রভুদের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

বিপ্লবীরা জালালাবাদ পাহাড়ে আস্তানা করেছিলেন। ২২শে এপ্রিল গোরা সৈন্যেরা এসে চারিদিক থেকে পাহাড়ে ওঠার চেষ্টা করলো। সকাল থেকে সন্ধ্যা পাঁচটা অবধি চললো লড়াই। বিপ্লবীদের মারা গেল বারোজন (টেগরা বল, ত্রিপুরা সেন, নরেশ রায়, বিধু ভট্টাচার্য, প্রভাস বল, মধু দত্ত, নির্মল লালা, জিতেন দাসগুপ্ত, পুলিন ঘোষ, শশাঙ্ক সেন, মতি কানুনগো ও অর্ধেন্দু দাসগুপ্ত)। আর সৈনিকদের মারা গেল প্রায় দেড়শো। শেষ অবধি সন্ধ্যাবেলা সৈনিকেরা ফিরে যেতে বাধ্য হোল।

বিপ্লবীদের খাবার ছিল না, শুধু আম খেয়ে তারা তিনদিন কাটিয়েছিলেন, এবার তাঁরা পাহাড় থেকে নেমে ছড়িয়ে পড়লেন চারিদিকে।

অমর নন্দী এসেছিলেন শহরের হাল-চাল দেখতে, পুলিশ তাঁকে তাড়া করলো। এক সাঁকোর নীচে পুলিশের সঙ্গে তিনি মুখোমুখি গুলি চালালেন, শেষে পুলিশের গুলিতেই তিনি প্রাণ দিলেন। আর চারজন বিপ্লবী গিয়েছিলেন ফেণী স্টেশনে। পুলিশ তাঁদের ধরার চেষ্টা করে। শেষে মুখোমুখি গুলি চালিয়ে তাঁরা পালিয়ে গেলেন।

দিন বারো পরে বিপ্লবীরা সৈনিকদের একটি ঘাঁটি আক্রমণ করার চেষ্টায় মুসলমানের বেশে সহরে এলেন। দলে ছিল ছ'জন। পথে পুলিশের সন্দেহ হোল, তারা পিছু ধরলো। বিপ্লবীরা সাম্পানে চড়ে নদী পার হয়ে সরে পড়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পুলিশ তাদের সঙ্গ ছাড়লো না, ওপারে নামতেই রীতিমত একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেল। চারজন বিপ্লবী নিহত হলেন (মনোরঞ্জন সেন, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, স্বদেশ রায় ও রজত সেন)। বাকী দু'জন আহত হয়ে ধরা পড়লেন (সুবোধ চৌধুরী ও ফণী নন্দী)।

এবার চট্টগ্রামে সান্ধ্য-আইন জারী হোল। মিলিটারিতে ছেয়ে গেল সারা সহর, ধরপাকড় আর অত্যাচার সুরু হোল।

ইতিমধ্যে অনন্ত সিংহ কলিকাতায় চলে এসেছিলেন। চট্টগ্রামে নিরীহ লোকদের উপর অত্যাচার হচ্ছে শুনে, তিনি নিজে কলিকাতায় এক থানায় গিয়ে ধরা দিলেন। থানার আপিসে গিয়ে তিনি বললেন—আমিই চট্টগ্রামের বিপ্লবী অনন্ত সিংহ।

যে পুলিশ অফিসারটি সামনে ছিল সে তাঁকে ধরবে কি, ত্রস্ত হতচকিত হয়ে পড়লো, তাড়াতাড়ি গিয়ে ঢুকলো এক টেবিলের নীচে।...

পুলিশ খবর পেলে ক'জন বিপ্লবী লুকিয়ে আছে চন্দন নগরে। টেগার্ট কলিকাতার পুলিশ নিয়ে গিয়ে ঘিরে ফেললেন শিক্ষয়িত্রী সুহাসিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ী। দু'দিক থেকে গুলি চললো,—মাখন ঘোষাল প্রাণ হারালেন, লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ, আনন্দ গুপ্ত, শশধর আচার্য ও সুহাসিনী গাঙ্গুলী ধরা পড়লেন। (১ সেপ্টেম্বর ১৯৩০)।

চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে মামলা সুরু হোল। সূর্য সেন তখনও ধরা পড়েননি। তিনি জেল, আদালত ও সহরের অনেকগুলি বড় বড় জায়গায় ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু খবরটা কেমন করে যেন পুলিশ জানতে পারলো, মাটি খুঁড়ে অস্ত্রশস্ত্র, বোমা, ডিনামাইট, প্রভৃতি বের করে ফেললো।

সূর্য সেনকে ধরার জন্য পুলিশ এবার চড়াও হোল ধলঘাটে সাবিত্রী দেবীর বাড়ীতে। পুলিশের গুলিতে অপূর্ব ও নির্মল প্রাণ হারালেন, মিলিটারি অফিসার ক্যামেরানকে গুলি করে সূর্য সেন, প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দার ও কল্পনা দত্ত পালিয়ে গেলেন।

এদিকে বছর দেড়েক ধরে মামলা চালিয়ে পুলিশ চৌদ্দ জনকে দ্বীপান্তরে পাঠালো—অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, লালমোহন সেন, সুবোধ রায়, ফনী নন্দী, আনন্দ গুপ্ত, ফকির সেন, সহায়রাম দাস, রণধীর গুপ্ত, সুখেন্দু দস্তিদার, অম্বিকা চক্রবর্তী ও সরোজ গুহ। (১ মার্চ, ১৯৩২)

মাস ছয়েক পরে ক'জন বিপ্লবী পাহাড়তলিকে সাহেবদের ক্লাব আক্রমণ করলেন। একজন সাহেব খুন হোল, জখম হোল তেরো জন।

বিপ্লবীদের নেত্রী প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দার আঘাত পেলেন, কিন্তু পুলিশের হাতে ধরা পড়ার আগেই আত্মহত্যা করলেন (২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৩২)।

ন'মাস পরে গাইরালা গাঁয়ে এক বাড়ীতে গুর্খাসৈন্যরা সূর্য সেনকে গ্রেপ্তার করলো। মনি দত্ত, কল্পনা দত্ত ও শান্তি চক্রবর্তী মিলিটারি ব্যূহ ভেদ করে পালালেন।

ক'দিন পরে কল্পনা দত্ত ও তারকেশ্বর দস্তিদার ধরা পড়লেন।

আরেক দফা বিচারে সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসী হয়ে গেল, কল্পনা দত্তের হোল যাবজ্জীবন জেল।

বিপ্লবী দল কিন্তু তবু নিঃশেষ হোল না।

গোয়েন্দা পুলিশের ইনেস্‌পেক্‌টার আসানুল্লা চট্টগ্রামে খুব অত্যাচার চালাচ্ছিল, পল্‌টনের মাঠে হরিপদ ভট্টাচার্য নামে পনেরো বছরের একটি ছেলে তাকে গুলি করে মারলেন। বয়স কম বলে হরিপদর ফাঁসী হোল না।

ক্রিকেট খেলার মাঠে সাহেবদের উপর ছেলেরা বোমা ফেললো, ক'জন সাহেব গুলি চালিয়ে দুটি ছেলেকে মারলো। কৃষ্ণ চৌধুরী ও হরেন চক্রবর্তীকে পুলিশ ফাঁসী দিল।

১৯৩৭ সালে এক গুপ্তচরকে হত্যা করার চেষ্টায় অমূল্য আচার্যের দশ-বছর জেল হোল।

ঢাকায় ইনেস্‌পেক্‌টার জেনারেল লোম্যান নিহত হলো। বিনয় বসু ধরা পড়লেন। পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেন্ট হডসন আক্রান্ত হলেন।...

লোম্যানের জায়গায় এলেন ক্রেইগ। চাঁদপুরে বিপ্লবীরা তার উপর গুলি চালালেন। কিন্তু মানুষ চিনতে ভুল হয়েছিল, রেল-পুলিশের ইনেস্‌পেক্‌টার তারিণী মুখুজ্যে নিহত হলেন। এই সম্পর্কে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসী হয়ে গেল, কালী চক্রবর্তীর বয়স কম বলে দ্বীপান্তর হোল।...

ঢাকা গোয়েন্দা বিভাগের বড়কর্তা গ্রাস্‌বি সাহেব বিকালবেলা মোটরে

বাড়ী ফিরছিলেন, বিপ্লবীদের গুলিতে তিনি আহত হন। তাঁর দেহরক্ষীর গুলিতে বিনয় রায় আহত হলেন, বিচারে বিনয়ের যাবজ্জীবন জেল হয়।

হীরালাল চক্রবর্তীকে পুলিশের গুপ্তচর ভেবে বিপ্লবীরা খুন করেন, এই সম্পর্কে অমূল্য রায়ের যাবজ্জীবন জেল হোল।

ফরিদপুরের চরমগুরিয়ায় বিপ্লবীরা ডাক লুঠ করলো। পুলিশের সঙ্গে তাদের একটা খণ্ড যুদ্ধ হয়ে গেল। এই সম্পর্কে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের ফাঁসী হোল, সুরেন করের হোল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।···গোয়েন্দা-পুলিশ কালিপদ ভট্টাচার্যকে ছেলেরা ছোরা নিয়ে আক্রমণ করে। এই সম্পর্কে আশু ভরদ্বাজ ও অমূল্য চৌধুরীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হোল।

কুমিল্লার জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভান্সকে গুলি করে মারলেন দুটি মেয়ে—শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী। তাঁদের যাবজ্জীবন জেল হোল।···

কালিগঞ্জে এক গুপ্তচরকে হত্যা করার চেষ্টায় বিরাজ দেব ধরা পড়লেন, আসামের ইটখোলা স্টেশনে ট্রেন লুঠ করার জন্যে তাঁকে অভিযুক্ত করা হোল। দু'দফায় তাঁর পঁয়তাল্লিশ বছর জেল হোল।

মেদিনীপুরে ১৯২৯ সাল থেকেই গোলমাল চলছিল। দাসপুর থানার দারোগা নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। পুলিশ চারজনকে ধরে জেলে দিল।···

তারপর সুরু হোল লবণ-আইন অমান্যের আন্দোলন, তখন পুলিশ ব্যাপকভাবে অত্যাচার চালায়। বহুলোক পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। বিপ্লবীরা প্রতিশোধ নেবার জন্য সচেষ্ট হন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পেডী এসেছিলেন মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষাপ্রদর্শনীতে, দুটি ছেলে তাঁকে গুলি করলো। পেডী পরদিন হাসপাতালে মারা গেলেন, বিমল দাসগুপ্ত ও জ্যোতিজীবন ঘোষ ধরা পড়লো, কিন্তু অপরাধ প্রমাণ হলো না (৭ এপ্রিল ১৯৩১)।

পরের বছর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাস জেলা-বোর্ডের সভা করছেন এমন সময় দুটি ছেলে তাঁকে গুলি করে হত্যা করলো (৩০ এপ্রিল

১৯৩২)। ধরা পড়লো প্রদ্যোতকুমার ভট্টাচার্য, আরেকজন পালালো। প্রদ্যোতের ফাঁসীর হুকুম হলো।

পরের বছর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বার্জ ফুটবল খেলতে মাঠে নেমেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ছুটি ছেলে তাঁকে গুলি করলো (২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩)। বার্জের দেহরক্ষীর গুলিতে দুটি ছেলেই প্রাণ হারালো—মৃগেন্দ্রকুমার দত্ত ও অনাথবন্ধু পাঁজা। এই সম্পর্কে কয়েক জনের ফাঁসী হলো—ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ রায় ও নির্মলজীবন ঘোষ, আর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হলো পাঁচজনের—সনাতন রায়, সুকুমার সেন, নন্দদুলাল সিংহ, কামাখ্যা ঘোষ ও শান্তিগোপাল সেন। নির্মলজীবনের ভাই নবজীবন ঘোষ পুলিশের অত্যাচারে ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ থানায় মারা গেল।

কলিকাতাতে গোলমাল কম হোল না। রাইটার্স বিল্ডিংয়ের তিন তলার উপর আপিস-ঘরে বাংলার জেলসমূহের ইনেস্‌পেক্‌টার-জেনারেল বসেছিলেন, দীনেশ গুপ্ত সেখানে তাঁকে গুলি করে মারলেন। দীনেশের ফাঁসী হয়ে গেল।...

পুলিশ কমিশনার টেগার্ট মোটরে যাচ্ছিলেন ডালহৌসি-স্কোয়ারের পথে, কোথা থেকে একটা বোমা এসে পড়লো, সামান্যের জন্য টেগার্ট রক্ষা পেলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৩১ সালের উপাধি-বিতরণ সভা বসেছিল সিনেট হলে। লাট সাহেব স্যার স্ট্যানলি-জ্যাকসন বক্তৃতা করছিলেন, বীণা দাস নামে একটি গ্রাজুয়েট মেয়ে তাঁর উপর গুলি চালালেন, লাট সাহেব অল্পের জন্য বেঁচে গেলেন। বীণা দাসের ন'বছর জেল হোল।...

স্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজখানি বরাবরই কংগ্রেসী ও বিপ্লবীদের শত্রু, এর সম্পাদকের উপর বিপ্লবীদের রাগ ছিল, দু'বার ওয়াট্‌সন সাহেবকে তাঁরা খুন করার চেষ্টা করে দু'বারই ব্যর্থ হন। প্রথমবারে বিপ্লবী ছেলেটি ধরা পড়ার সম্ভাবনা দেখে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে। দ্বিতীয় বারে পুলিশ দু'জনকে পাকড়াও করে।

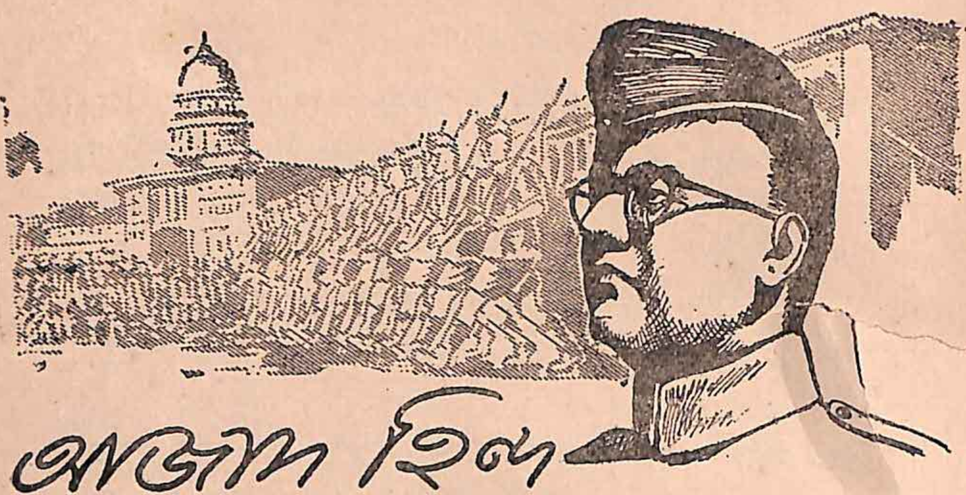
কর্ণোয়ালিস স্ট্রীটের এক বাড়ীতে তিনজন বিপ্লবী লুকিয়ে ছিলেন, পুলিশ তাঁদেরকে ধরতে গেলে, দু'দলে একটা খণ্ডযুদ্ধ হোল। তিনজনই ধরা পড়লেন—জগদানন্দ মুখুজ্যে, দীনেশ মজুমদার ও নলিনী দাস। (দীনেশ ও নলিনী কিছুদিন আগে হিজলী জেল থেকে পালিয়ে এসেছিলেন, টেগার্ট সাহেবকে খুন করার চেষ্টায় দীনেশ সেখানে যাবজ্জীবন জেল খাটছিলেন)। দীনেশের ফাঁসী হয়ে গেল, বাকী দু'জনের হোল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।...

১৯৩৩ সালে কলিকাতায় এক বিরাট ষড়যন্ত্র ধরা পড়লো, তাতে চারজন ছেলের যাবজ্জীবন, আর পঁচিশ-ছাব্বিশ জনের হোল সাত বছর করে জেল।

দার্জিলিংয়ে বাংলার লাটসাহেব জন-এণ্ডারসনের উপর বিপ্লবীরা গুলি চালালেন, লাটসাহেবের লাগলো না, কিন্তু এই সম্পর্কে ভবানী ভট্টাচার্যের ফাঁসী হয়ে গেল।

এতো ফাঁসী, দ্বীপান্তর ও জেল হওয়া সত্ত্বেও ইতস্তত: বিপ্লবীদের প্রচেষ্টা সমভাবেই চলতে লাগলো। দিনাজপুরে হিলি স্টেশনে সরকারী ডাক লুঠ করার চেষ্টা হোল।...রংপুরে এক ডাকাতির ষড়যন্ত্র ধরা পড়লো।...টিটাগড়ে ধরা পড়লো আর-এক ষড়যন্ত্র মামলা...বাংলাদেশটাই যেন বিপ্লবীদের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠলো।

এই বিপ্লবের ঢেউ ১৯৪০ সালে বিলাতে গিয়েও পৌছালো। জালিয়ানওয়ালা-বাগের হত্যাকাণ্ডের নায়ক জেনারেল ডায়ার ইণ্ডিয়া-হাউসে যাবার পথে খুন হোল। পাঞ্জাবী বিপ্লবী উধম সিং আজাদের ফাঁসী হয়ে গেল। বিচারের সময় উধম বললেন—এতদিনে জালিয়ানওয়ালাবাগের নিহতদের তর্পণ করা হোল, তাদের আত্মা শান্তি পেল।



কড়া আইন করে, হাজার হাজার ছেলেকে বিনা বিচারে জেলে পুরে, মিলিটারি দিয়ে অত্যাচার চালিয়ে ইংরেজরা ভেবেছিল এ-দেশ থেকে বিপ্লবকে একেবার মুছে ফেলবে কিন্তু তা তারা পারেনি। বিপ্লবীদের সংগঠন কত নিখুঁৎ তা বুঝতে পারা যায় সুভাষচন্দ্র বসুর এদেশ থেকে পালিয়ে যাবার ব্যাপারে। ভারতের অতি সাধারণ পুলিসটি পর্যন্ত যাঁকে চেনে, তিনি কলিকাতা থেকে কাবুল চলে গেলেন নির্বিবাদে, কারুর মনে এতটুকু সন্দেহ অবধি জাগলো না।

সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস করতেন—দেশ স্বাধীন করতে হলে লড়াই করতে হবে। আর সেই লড়াই করার সব চেয়ে ভালো সুযোগ এসেছে আজ, ইংরেজ যখন জার্মানি,-ইতালি ও জাপানের মার খেয়ে বিভ্রান্ত হয়ে উঠেছে। ইংরেজের শত্রুদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে এই সময় ইংরেজকে এদেশ থেকে তাড়াতে হবে।

সুভাষচন্দ্র জেলে ছিলেন। জেলে তিনি দাড়ী কামানো ছেড়ে দিলেন। বেশ একমুখ দাড়ী হবার পর তিনি জেল থেকে মুক্তি পাবার জন্য উপবাস সুরু করলেন। কারাগার থেকে তাঁকে বাড়ীতে পাঠানো হোল। বাড়ীর দরজায় কড়া পাহারা বসলো। পাহারাদারের চোখকে

ফাঁকী দিয়ে পাঞ্জাবীর পোষাকে তিনি একদিন মোটর নিয়ে চলে এলেন গোমো স্টেশনে (১৭ই জানুয়ারী ১৯৪১)...সেখান থেকে ট্রেনে চড়ে পেশোয়ার,...পেশোয়ার থেকে হাঁটাপথে কাবুল—লালা উত্তমচাঁদের বাড়ীতে। কাবুল থেকে মস্কো হয়ে তিনি বার্লিন পৌঁছুলেন (২৬শে মার্চ, ১৯৪১), হিটলারের সঙ্গে দেখা করলেন, যে সব ভারতীয় সৈনিক জার্মান ও ইতালিয়ানদের হাতে বন্দী হয়েছিল, তাদেরকে নিয়ে আজাদ-হিন্দ্-বাহিনী গড়ে তুললেন। পঁয়ত্রিশ হাজার লোক ছিল এই বাহিনীতে। জার্মান সেনাপতিরা এদেরকে রীতিমত জার্মান কায়দায় যুদ্ধ শেখালো। ড্রেসডেন শহরে এরা হিটলারকে অভিবাদন জানালো, হিটলার সুভাষ-চন্দ্রকে সম্ভাষণ করলেন 'স্বাধীন ভারতের ফুয়েরার' বলে, আর এই বাহিনীর নাম দিলেন—'ফ্রীস্ ইণ্ডিয়েন'। এদের অফিসার ছিলেন—লেফ্টেন্যাণ্ট যশোবন্ত সিং সিদ্ধা, হাসতান, লেফ্টেন্যাণ্ট জামিল খাঁ, লেফ্টেন্যাণ্ট ওরবাচন সিং, লেফ্টেন্যাণ্ট আলী খাঁ, ডাক্তার ইশাক, ডাক্তার পটনেকার ও হাবিলদার গুরুমুখ সিং।

ইকবল সইদাই ও নিরঞ্জন সিং ইতালিতেও আজাদ-হিন্দ-বাহিনী সংগঠন করলেন।

দু'বছর বাদে সুভাষচন্দ্র এলেন সিংহপুরে (২রা জুলাই ১৯৪৩)। সেখানে এক মহা-সম্মেলন বসলো। শ্যাম, যবদ্বীপ, মালয়, ফিলিপাইন—সব জায়গা থেকে মুক্তি-পাগল ভারতীয়েরা ছুটে এলেন, বললেন—নেতাজী, কি করতে হবে হুকুম করুন।

গড়ে উঠলো গান্ধী-বাহিনী, জহর-বাহিনী, আজাদ-বাহিনী, সুভাষ-বাহিনী, মেয়েদের ঝাঁসীর-রাণী-বাহিনী, ছেলেদের কিশোর সেনাদল। নূতন সৈনিক তৈরী করার জন্য মালয়ে শিক্ষা-শিবির বসলো। সুভাষচন্দ্র বললেন—ভারতের স্বাধীনতাই আমাদের লক্ষ্য। পৃথিবীতে আজ এমন কোন শক্তি নেই যা ভারতবাসীকে স্বাধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখতে পারে।

স্বাধীন ভারতসরকার গঠিত হোল (২৬শে অক্টোবর, ১৯৪৩)। রাষ্ট্রপতি ও সৈনিকদের সর্বাধিনায়ক হলেন : সুভাষচন্দ্র বসু।

প্রধান উপদেষ্টা হলেন : রাসবিহারী বসু।

আইন-সচিব : এ. এন. সরকার। অর্থসচিব : মেজর জেনারেল অনিলচন্দ্র চ্যাটার্জী। প্রচার সচিব : এম. এ. আয়ার।

সেক্রেটারী : আনন্দমোহন সহায়।

পরামর্শক-মণ্ডলী : দেবনাথ দাস, সর্দার ঈশ্বর সিং, জে. থিবি, এ. ইয়েলাপ্পা, ডি. এস. খাঁ ও করিমগণি।

সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি হলেন : লেফ্টেন্যাণ্ট কর্ণেল এন. এস্. ভগৎ, লেঃ কঃ জে. কে. ভোঁসলা, লেঃ কঃ গুলজারা সিং, লেঃ কঃ এ. পি. লোকনাথন, লেঃ কঃ আজিজ-আমেদ, লেঃ কঃ এম. জেড. কিয়ানি, লেঃ কঃ আহসান কাদির, লেফ্টেন্যাণ্ট কর্ণেল শা'নওয়াজ ও ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামীনাথন্।

নয়টী রাজ্য এই নতুন সরকারকে মেনে নিল—জার্মানি, ইতালি, জাপান, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ, মাঞ্চুরিয়া, ফিলিপাইন, আয়ার্ল্যাণ্ড ও ক্রোশিয়া।

সর্বত্র গবর্মেণ্টের শাখা ছড়িয়ে পড়লো : ব্রহ্মদেশে ১০০টী, মালয়ে ৭০টী, থাইল্যাণ্ডে ২০টী, তাছাড়া আন্দামান, যবদ্বীপ, বোর্নিও, সেলিবিস, ফিলিপাইন, চীন, মাঞ্চুরিয়া ও জাপানেও আফিস বসলো।

আজাদ-হিন্দ নামে রেডিও স্টেশন বসলো।

'পূর্ণ স্বরাজ,' 'আজাদ হিন্দ্' 'দিল্লী চলো' নামে তিনখানি দৈনিক ও 'জয়হিন্দ' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হোল।

আজাদ হিন্দ্ ডাকটিকিট বেরুলো।

আজাদ-হিন্দ্ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হোল। এই ব্যাঙ্কে প্রায় কুড়ি কোটী টাকা সংগৃহীত হয়েছিল। এই টাকা সংগ্রহের ইতিহাস পৃথিবীতে অপূর্ব। নেতাজী বললেন—টাকা চাই, স্বাধীন ভারতের কাজ টাকা না হলে চলবে না।

যার যা ছিল সে তাই দিল—মেয়েরা গায়ের গহনা খুলে দিল, ভিখারী

তার ভিক্ষার ঝুলি উজোর করে দিল, ছোট ছেলে তার পয়সা-জমানো কৌটো খালি করে দিল, রেংগুনে এক ব্যবসায়ী দিলেন ৬৩ লাখ টাকা, ব্রহ্মের এক জমিদার তার কোটী টাকা দামের জমিদারীই দিয়ে দিলেন। এক একটি সভায় নেতাজীর গলায় যে ফুলের মালা পরিয়ে দেওয়া হোত, তা'ই নিলাম করে লাখ লাখ টাকা উঠতো, একবার তো একটি মালা বিক্রী হয়েছিল বারো লাখ টাকায়।

এবার সুরু হোল আক্রমণ, নেতাজী বললেন—এ যুদ্ধে আমরাই জয়ী হব। দিল্লীর লাল কিল্লায় বীরের বেশে প্রবেশ না করা পর্যন্ত আমাদের কাজ শেষ হবে না।…'দিল্লী চলো' রণ-হুঙ্কারে আমরা যাত্রা করি এসো—দিল্লীর লাল কিল্লায় জাতীয় পতাকা শোভিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের বিরাম নেই!

মুক্তি-পাগল সৈন্য বেরিয়ে পড়লো—একদল চললো ইম্ফলের দিকে, আর-এক দল কোহিমার দিকে—ভারতভূমি তখন তাদেরকে ডাকছে। তাদের কণ্ঠের রণ-সঙ্গীত পাহাড়ের বুকে সাড়া তুললো ঃ

কদম কদম বাঢ়ায়ে যা
খুশীকে গীত গায়ে যা
য়হ জিন্দগী হৈ কৌম কী
কৌম পর লুটায়ে যা—

তু শেরে-ই-হিন্দ আগে বঢ়
মরণসে ফির ভী তুঁ ন ডর
আসমান তক্ উঠাকে শর
জোশে বতন বঢ়ায়ে যা—

তেরী হিম্মৎ বাঢ়তী রহে
খুদা তেরী সুনতা রহে
যে সামনে তেরে চঢ়ে
তো খাঁকসে মিলায়ে যা—

চলো দিল্লী পুকারকে
কৌম-ই নিশান সম্‌হাল্‌কে
লাল কিল্লে পয় গাড়কে
লহরায়ে যা, লহরায়ে যা—

একদল আক্রমণ করলো ইম্‌ফল, আর-একদল এগুলো কোহিমার পথে। ইম্‌ফল-কোহিমা সড়কের খানিকটা দখল হোল। ভারতের মাটিতে স্বাধীন ভারতের বাঘ-মার্কা নিশান উড়িয়ে দিলেন সেনা-নায়ক শা'নওয়াজ (১৮ই মার্চ, ১৯৪৪)।

ফৌজ কিন্তু বেশীদূর অগ্রসর হতে পারলো না। জাপানীদের কাছ থেকে যতটা সাহায্য পাবার আশা করা হয়েছিল তা পাওয়া গেল না। খাবার, পোষাক, ও অস্ত্রের অভাব দেখা দিল। এদের একখানিও বিমান ছিল না, বৃটিশ বোমারু বিমানের নীচে তারা দাঁড়াতে পারলো না, তার উপর নামলো প্রচণ্ড বর্ষা। আজাদ-হিন্দ বাহিনীকে এবার পিছুতে হোল। কর্ণেল সেহগল আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন (১৮শে এপ্রিল ১৯৪৫), ধীলন ধরা পড়লেন (১৩ই মে), শা'নওয়াজ বন্দী হলেন (১৮ই মে)।

নেতাজী বললেন—আমাদের স্বাধীনতা-যুদ্ধের প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হোল, কিন্তু এ'তো সবে সূচনা মাত্র, আমাদেরকে আরও অনেক লড়াই লড়তে হবে। আমি চিরদিন আশাবাদী, কোন অবস্থাতেই আমি পরাজয় স্বীকার করি না। ইনকিলাব্‌-জিন্দাবাদ, আজাদ-হিন্দ জিন্দাবাদ !

ইতিমধ্যে জার্মানরা হেরে গেছে, এটম্ বোমা খেয়ে জাপানীরাও আত্মসমর্পণ করলো (১৫ই আগস্ট '৪৫)। সুভাষচন্দ্র বিমানে ছুটলেন তোকিওর দিকে। পথে বিকল হয়ে বিমানখানি পড়ে গেল, নেতাজী আহত হলেন। তাইহোকুর হাসপাতালে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো, পরে প্রচারিত হলো সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। (১৮ই আগস্ট '৪:)।

ব্রহ্মদেশ, মালয় ও অন্যান্য স্থানে ইংরেজরা সাড়ে উনিশ হাজার আজাদী সেনাকে বন্দী করে। প্রধান প্রধান সেনানীদের বিচারের জন্য

নয়টি সামরিক আদালত গঠন করা হোল। যে লাল কেল্লায় বিজয়ীর বেশে তারা আসতে চেয়েছিল, সেই লাল কেল্লায় বসলো তাদের বিচার-সভা। সমগ্র জাতি এর প্রতিবাদ তুললো, বড় বড় মিছিল বেরুলো, পুলিশ মিছিলের উপর গুলি চালালো। রামেশ্বর বাঁড়ুয্যে, দেবব্রত বিশ্বাস প্রভৃতি গুলিতে নিহত হলেন। জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে মিলিটারি লরী আক্রমণ করে আগুন লাগাতে সুরু করে দিল। কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি সহরে দিনের পর দিন ধরে চললো হাংগামা। ছাত্ররা দাবী করলো—আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি চাই!

শেষে জনমতকে স্বীকার করে নিতে হোল, শা'নওয়াজ, ধীলন ও সেহগল মুক্তি পেলেন। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য আজাদী সৈনিক ও সেনানীর মুক্তির ব্যবস্থা হোল। এই মামলা চালিয়ে কংগ্রেসের ভুলাভাই দেশাই অসাধারণ আইন-জ্ঞানের পরিচয় দেন।

আজাদ হিন্দ সরকার ভারতের মধ্যেও যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করেন। সাব্‌মেরিনে গুপ্তচর এসে নামে ভারতের উপকূলে কিন্তু তারা অনেকেই ধরা পড়ে যায়। এদেরকে সাহায্য করার জন্য হরিদাস মিত্র ও আরো তিন জনের ফাঁসীর আদেশ হয়, পরে গান্ধীজীর চেষ্টায় তাঁরা রক্ষা পান।

কিন্তু কিছুদিন পরেই আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপটেন রশীদ আলিকে সাত বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এর বিরুদ্ধে কলিকাতায় ছাত্রেরা প্রতিবাদ করে, (১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬)। পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের গোলযোগ বাধে। পুলিশ গুলি চালায়। জনতা কালীঘাট ট্রাম-ডিপো পুড়িয়ে দেয়, নৈহাটী স্টেশনে ট্রেন আটক করে, কাঁকিনাড়া স্টেশনে আগুন লাগায়, কলিকাতায় শ্যামপুকুর থানা ও মাণিকতলায় পুলিশের গাড়ী লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ে, মিলিটারি লরীতে আগুন দেয়। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লাইনে জনতা দু'খানি ট্রেন আটকে আগুন ধরিয়ে দেয়। পাঁচ দিন ধরে হাংগামা চলে, সাতান্ন জন মারা যায়, আহত হয় প্রায় চারশো। সরকার মিলিটারির সাহায্যে এই বিপ্লব দমন করে।



আজাদ-হিন্দ্ তো শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারলো না, কিন্তু মানুষের মনে যখন পরাধীনতার বেদনা জাগে তখন বিদ্রোহ জেগে ওঠে সহজাত হয়ে। ভারতের নৌ-সেনাদের বিদ্রোহও এমনি সহজাত প্রকাশ।

এড্‌মিরাল গড্‌ফ্রে এলেন 'তলোয়ার ক্যাম্পে' পরিদর্শন করতে। পাঁচিলের গায়ে লেখা দুটি কথা তাঁর চোখে পড়লো—'কুইট্ ইণ্ডিয়া, জয় হিন্দ।'—কে লিখেছে, কে?

—সিগন্যালম্যান পি. সি. দত্ত!

তখনই দত্তকে ধরে তিনমাস জেল দেওয়া হোল।

কম্যাণ্ডার কিং ছিলেন কম্যাণ্ডিং অফিসার, নাবিকেরা গিয়ে জানালো—র‍্যাশন এতো খারাপ যে খেতে পারছি না।

কিং গালি দিয়ে উঠলেন—কী! যত কুলি-মজুরের বাচ্চা, বাড়ীতে এতো ভালো খাবার জোটে!

নাবিকেরা বললো—বেশ! তাহলে একটা বোঝাপড়া করা যাক! সাড়া তুললো—ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

ধর্মঘট সুরু হোল—তলোয়ার, ফিরোজ, আকবর ও মাচলিমার শিক্ষা শিবিরে এবং নাসিক, কলাবতী, আউধ ও নিলাস জাহাজে। বোম্বাই

শহরে বেরুলো বিরাট শোভাযাত্রা। পথে অনেক পুলিশ অফিসার ও সৈনিক মার খেল। পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টও মার খেলেন। যেখানে যত ইউনিয়ন-জ্যাক ছিল সব নামিয়ে দিয়ে জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দেওয়া হোল।

বন্দরের কুড়িখানি জাহাজ বিদ্রোহীদের দলে যোগ দিল—ধর্মঘটীদের সংখ্যা হোল প্রায় পঁচিশ হাজার।

ওয়ারলেশে খবর ছড়িয়ে দেওয়া হোল। গোরা অফিসারদের তু'ব্যবহারে সর্বত্রই অসন্তোষ ছিল। বোম্বাইয়ের ভারতীয় বৈমানিকেরা ধর্মঘট করলো। কলিকাতায় বেহালার নৌশিক্ষা শিবির, 'হুগলী' জাহাজের শিক্ষার্থীরা, মাঝেরহাটের নৌসেনারা ও মাদ্রাজের 'আদিয়ার' রণতরীর সৈনিকেরা কাজ বন্ধ করলো। করাচি বন্দরে চারখানি জাহাজ ছিল,—'চমক', 'হিমালয়', 'বাহাতুর' ও 'হিন্দুস্থান'; সোজাসুজি তারা জানিয়ে দিল—সন্ধ্যা ছ'টার মধ্যে আমাদের দাবী না মানলে আমরা সৈন্যদের উপর গুলি চালাবো।

সামরিক পুলিশ বন্দর থেকে 'হিন্দুস্থানের' উপর গুলি চালালো। 'হিন্দুস্থান' কামান দেগে তার জবাব দিল।

বোম্বাইয়ে নৌ-সেনাপতি এডমিরাল গডফ্রে বেতারে বিদ্রোহীদের ধমক দিল—বিদ্রোহীদের আমরা দমন করবই, প্রয়োজন হলে সমস্ত নৌবহর ধ্বংস করতেও আমরা পিছ্-পা হব না।

এর উত্তরে বোম্বাইয়ের বিদ্রোহীরা ক্যাস্‌ল্ ব্যারাকের অস্ত্রাগার লুঠ করলো, বন্দরের কুড়িখানি জাহাজ তিনখানি বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজকে দখল করে ফেললো। বেতারে সিগ্‌ন্যাল পাঠান হোল—পেশোয়ার ভারতীয় বিমান-বাহিনী,···আম্বালা এরোড্রোম···হংকং ও সিংহপুরে অবস্থিত যুদ্ধ জাহাজ 'কৃষ্ণা', 'শাটলেজ', 'গোদাবরী', 'কাবেরী'···

পেশোয়ার থেকে বিমান-বাহিনী খবর দিল—অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমরা প্রস্তুত আছি, নির্দেশ পেলেই রওনা হই।

হংকং ও সিংহপুর থেকে নৌবাহিনী জানালো—ভারতের দিকে অগ্রসর হচ্ছি।

এদিকে আদেশ হোল—বিদ্রোহীদের শেষ কর!

মারাঠা সৈনিকেরা আদেশ মানলো না, চুপ করে তারা দাঁড়িয়ে রইল। গোরা সৈন্যেরা এসে বিদ্রোহীদের উপর কামান দাগলো। বিদ্রোহীরাও চুপ করে রইল না। সুরু হোল রীতিমত লড়াই। প্লেন থেকে বিদ্রোহীদের জাহাজে প্যারাচুট-বাহনী নামিয়ে দেবার চেষ্টা হোল কিন্তু বিদ্রোহীদের 'গানের' সামনে সে চেষ্টা ব্যর্থ হোল।

এদিকে বোম্বাই শহরে জনসাধারণ তুমুল কাণ্ড করে বসলো। তারা ইম্‌পিরিয়াল ব্যাঙ্কের তিনটি শাখা ভেঙে-চুরে তচনচ করে দিল, চল্লিশখানি সামরিক লরী পুড়িয়ে দিল, বারোটি পোস্টাপিস ও ত্রিশটি র‍্যাশনের দোকান লুঠ করলো। পুলিশ কলবাদেবী, ভুলেশ্বর ও গিরগাঁও অঞ্চলে কুড়ি বার গুলি চালালো,—ষাটজন মরলো, ছ'শো জখম হোল। পুলিশও কিছু-কিছু মার খেল। একজন কনস্টেবল খুন হোল, সাঁইত্রিশ জন অফিসার ও নব্বুই জন পাহারাওলা জখম হোল। মহম্মদ আলি রোড ও জে. জে. হাসপাতালের মোড়ে পুলিশ ও জনতায় রীতিমত একটা খণ্ড যুদ্ধ হয়ে গেল।

২১শে ফেব্রুয়ারী গডফ্রে সাহেব জানিয়ে দিলেন—রাত বারোটার মধ্যে বিদ্রোহী নাবিকেরা যদি আত্মসমর্পণ না করে তাহলে রাজকীয় বিমান-বাহিনী বোম্বাই শহরের উপর বোমা বর্ষণ করবে এবং বৃটিশ যুদ্ধ-জাহাজ থেকে কামান দেগে শহর ধ্বংস করা হবে।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল মধ্যস্থ হলেন, বললেন—লড়াই বন্ধ কর, অস্ত্র ফিরিয়ে দাও, কোন ভয় নেই, কারুর শাস্তি হবে না।

বিদ্রোহীদের হাতে তখন দু'বছর লড়াই করার মত গুলি-গোলা এসে পড়েছে, কিন্তু সর্দারজীর কথায় তারা ধরা দিল। সরকার ৩৬৫ জন নৌ-সেনাকে ধরে কিছুদিন আটকে রাখলো, তারপর ছেড়ে দিল।

সিপাহী বিদ্রোহের পর এত বড় বিদ্রোহ আর এদেশে ঘটেনি।



দেশীয় রাজ্যে প্রজা আন্দোলন

ইংরেজরা এদেশকে শাসনের দিক থেকে দু'ভাগে ভাগ করে রেখেছিল—বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্য। এই দেশীয় রাজ্যগুলির রাজারা আসলে ইংরেজদেরই অধীন, এঁরা যা কিছু করেন ইংরেজের মুখ চেয়ে করেন, এবং সব বিষয়ে উপদেশ দেবার জন্য এদের কাছে পলিটিক্যাল এজেণ্ট নামে একজন করে ইংরেজ মাতব্বর রাখা হয়, এই এজেণ্টরাই হলেন এই সব রাজাদের মুরুব্বি।

সমস্ত দেশটাকে নিজেদের হাতে না রেখে মাঝে মাঝে এক একজন রাজাকে জিইয়ে রাখার ভিতরে ইংরেজের রাজনৈতিক কৌশল আছে। ইংরেজরা চেয়েছিল এ দেশের সম্পদ শোষণ করতে, দেশীয় রাজারাও চান প্রজাদের পয়সায় নিজেদের বিলাস উপভোগ করতে। দু'জনের স্বার্থ এক, কাজেই একজন আর-একজনকে টিঁকিয়ে রাখার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করে না। এই কথা ভেবেই ১৮৬০ সালে বড়লাট ক্যানিং সাহেব লিখেছিলেন—যদি আমরা সমস্ত ভারতবর্ষকে কতকগুলি জেলাতে বিভক্ত করতাম, তাহলে আমাদের সাম্রাজ্য পঞ্চাশ বছরও টিকতো না, কিন্তু আমরা যদি কতকগুলি দেশীয় রাজ্য সৃষ্টি করি যাদের কোন ক্ষমতাই থাকবে না, আমাদের সাম্রাজ্য রক্ষার তারাই হবে হাতিয়ার। তাহলে আমাদের নৌশক্তি যতদিন থাকবে ততদিন ভারত সাম্রাজ্যও থাকবে।

এই সম্পর্কে সত্তর বছর পরে ১৯৩০ সালে অধ্যাপক রাশব্রুক লেখেন—'এই সামন্ততান্ত্রিক রাজ্যগুলি বৃটিশ সরকারের রক্ষা কবচ। এই সব দেশীয় রাজ্য ভারতময় ছড়িয়ে থাকায় ভারতবর্ষ থেকে বৃটিশকে কোন ব্যাপক বিদ্রোহ করে হটিয়ে দেওয়া কষ্টকর হবে।'

এই ধারণা যে একেবারে মিথ্যা নয় তা সিপাহী যুদ্ধের সময় স্পষ্টই দেখা যায়, অধিকাংশ সামন্ত রাজাই তখন ইংরেজকে সাহায্য করেছিল।

এবং এদের কাছ থেকে ভবিষ্যতে আরো সাহায্য পাবার আশায় ১৯২১ সালে বাট্‌লার-কমিটীর চেষ্টায় মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কারে সমস্ত সামন্ত-রাজাকে সংঘবদ্ধ করার জন্য বৃটিশ সরকার এদেশে 'নরেন্দ্র-মণ্ডল' প্রতিষ্ঠা করেন।

কিন্তু সারা ভারতে যখন গণ-আন্দোলনের জোয়ার এলো, তখন দেশীয় রাজ্য বলে তো সেখানকার প্রজারা চুপ করে বসে থাকতে পারে না। ১৯২৯ সালে প্রজারা স্টেট্‌-কংগ্রেসের পত্তন করলেন। এদের কাজ হোল সামন্ত রাজাদের স্বেচ্ছাচার থেকে প্রজাদের অধিকার আদায় করে নেওয়া।

প্রজা আন্দোলন বোধ হয় প্রথমে দেখা দেয় ১৯০৮ সালে ত্রিবাংকুরে। এর নেতা ছিলেন ভেলু থাম্‌পি। কিষাণরা রীতিমত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রাজবাড়ী আক্রমণ করে ও দখল করে নেয়। কিন্তু পরে রীতিমত সৈন্য এসে পড়লো, লড়াই স্থুরু হয়ে গেল, বিদ্রোহীরা পরাজিত ও নিহত হলেন।

১৯২০ সালে ত্রিবাংকুরে আবার ছাত্রদের বিক্ষোভ দেখা দেয়। লাঠি চালিয়ে, গুলি মেরে আন্দোলন দমিয়ে দেবার চেষ্টা হয়, কিন্তু আন্দোলন থামে না। শেষে গান্ধীজী মধ্যস্থ হলেন। স্যার সি. পি. রামস্বামী আয়ার তখন ওখানকার দেওয়ান, কথা দিলেন—অপরাধীদের ক্ষমা করা হবে এবং প্রজাদের অধিকার মেনে নেওয়া হবে। কিন্তু শেষ অবধি কথা রাখলেন না, দু'জনের ফাঁসী হোল, শতশত লোককে পাঠানো হোল জেলে।

১৯৩৮ সালে হায়দরাবাদে 'ওম্' আন্দোলন হয়। হায়দরাবাদের নিজাম মুসলমান, সরকারী কর্মচারীদের শতকরা আশীজন মুসলমান, কিন্তু প্রজাদের শতকরা পঁচাত্তর জন হিন্দু। ওখানে হিন্দুদের ধর্মচর্চার অধিকার ক্ষুন্ন করার চেষ্টা হয়, হিন্দুরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। ভারতের সব জায়গা থেকে এখানে স্বেচ্ছাসেবক আসতে সুরু করে। এই সম্পর্কে প্রায় চারশো জনের জেল হয়। শেষে একশো জন হিন্দু নেতা বড়লাটের কাছে প্রতিকারের জন্য আবেদন করলেন, তখন একটা মিটমাট হোল ও সত্যাগ্রহীরা মুক্তি পেল। কিন্তু নিজাম-সরকার রাজ্যের মধ্যে স্টেট্-কংগ্রেসের ১২০০ কমিটীকে বে-আইনী বলে নিষিদ্ধ করে রাখলেন পূরো আটটি বছর।

১৯৪৬ সালে যুদ্ধের পর ত্রিবাংকুর ও হায়দরাবাদ রাজ্যের কৃষক ও মজুরদের মাঝে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তখন প্রজারা কয়েকটি সুখ-সুবিধা দাবী করে। ত্রিবাংকুরের পুলিশ তখন গুলি চালিয়ে প্রায় হাজার খানেক মজুরকে খুন করে। হায়দরাবাদে অন্ধ্র চাষীদের শায়েস্তা করার জন্য চার হাজার সৈন্য ও সশস্ত্র পুলিশ পাঠানো হয় নলগোণ্ডা জেলায়, তারা নানা অত্যাচার করে চাষীদের কাছ থেকে এক লাখ টাকা পাইকারী জরিমানা আদায় করে।

১৯৩৯ সালে কাথিয়াবাড়েও প্রজা-আন্দোলন দেখা দিল। ছোট রাজ্য রাজকোট, সেখানকার রাজা ঠাকুর-সাহেব প্রজাদের অধিকার রক্ষার জন্য এক চুক্তি করেন সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে, কিন্তু সে চুক্তি তিনি রাখেননি। গান্ধীজী তখন রাজকোটে গিয়ে প্রজাদের পক্ষ নিয়ে উপবাস সুরু করলেন। বড়লাট মধ্যস্থ হলেন। ভারতীয় ফেডারেল কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার মরিস-গয়ার চুক্তির সর্তগুলি বিশ্লেষণ করে দেখেন এবং ঠাকুর-সাহেবের বিরুদ্ধে রায় দেন।

এই সময় ঢেনকানল, তালচের, রণপুর, জয়পুর প্রভৃতি রাজ্যের প্রজারাও শাসন-অধিকার পাবার জন্য আন্দোলন চালায়। রণপুরের পলিটিক্যাল-এজেন্ট মেজর বাজালগেট এক জনতা দেখে ভয় পেয়ে গুলি

চালায়, দু'জন খুন হয়। তখন জনতা ক্ষেপে উঠে বাজালগেটকে খুন করে।...গাংপুর রাজ্যে পুলিশ গুলি চালায়, তাতে ২০ জন খুন হয়, জখম হয় ৪০ জন।...তালচের রাজ্যের রাজা এমন অত্যাচার করে যে সত্তর হাজার প্রজার মধ্যে বত্রিশ হাজার প্রজা বাড়ী-ঘর ছেড়ে বৃটিশ ভারতে পালিয়ে আসে।...জয়পুরে সত্যাগ্রহীদের নেতৃত্ব করেন যমুনালাল বাজাজ, সেখানে প্রজাদের অধিকার স্বীকৃত হয়।

হায়দরাবাদের ঠিক বিপরীত হচ্ছে কাশ্মীরের অবস্থা। এখানকার প্রজারা আশীজন মুসলমান আর রাজা হিন্দু। এখানকার প্রজা-আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন শেখ্ আবদুল্লা। পণ্ডিত জওহরলাল কাশ্মীর সম্পর্কে একটা মিটমাটের চেষ্টা করতে গেলে ওখানকার পুলিশ পণ্ডিতজীকে গ্রেপ্তার করে। শেখ আবদুল্লাকেও তারা জেলে পাঠালো। কিন্তু শেষ অবধি প্রজাদের অধিকার স্বীকৃত হয়। পাকিস্তানী হানদাররা যখন কাশ্মীর আক্রমণ করে শ্রীনগরের ১৮ মাইল মধ্যে এসে পড়লো তখন কাশ্মীর-রাজ রাজ্যরক্ষায় পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ভারতীয় সৈন্য চেয়ে পাঠালেন এবং আবদুল্লাকেই প্রধান মন্ত্রী করে প্রজাদের অধিকার স্বীকার করতে বাধ্য হলেন।

সর্বসমেত ভারতে ৫৬৫টি দেশীয় রাজ্য ছিল। এঁদের মধ্যে এমন রাজ্যও ছিল যার প্রজা মাত্র ২৭ জন আর বার্ষিক আয় মাত্র ৮০৲ টাকা। আবার নিজামের মত রাজাও ছিল যার টাকার শেষ নাই, দরকার হলে যারা যে কোন অত্যাচার চালাতে পারে। গরীব চাষীরা মজুরী বৃদ্ধি করতে চাইলে, যারা পুলিশ দিয়ে চাষীদের বাড়ী লুঠ করিয়ে এক লাখ টাকা পাইকারী জরিমানা আদায় করে। মাত্র এক বছরের ইতিহাস দেখলে জানা যায় যে গোয়ালিয়র, আলোয়ার, যশল্মীর, বিকানীর, রামপুর, কাশ্মীর, রতলম, ভরতপুর, হায়দরাবাদ, ত্রিবাংকুর, জয়পুর, মাড়োয়ার, রেওয়া, ইন্দোর প্রভৃতি রাজ্যে পুলিশের অত্যাচারে অন্ততঃ পাঁচশো লোক নিহত হয়েছে। সামন্ত রাজারা প্রজাদের মুখের পানে তাকাতেন না, তাকাতেন নিজেদের

বিলাসের পানে। নিজেদের জন্য কি ভাবে তাঁরা টাকা খরচ করতেন রাজস্ব ব্যয়ের হিসাবটা দেখলেই সে কথাটা স্পষ্ট হবে :

ইংলণ্ডের রাজা	রাজস্বের	১৬০০	টাকায়	১	টাকা গ্রহণ	করেন।
বেলজিয়ামের রাজা	„	১০০০	„	১	„ „	„
ইতালির রাজা	„	৫০০	„	১	„ „	„
জাপানের মিকাডো	„	৪০০	„	১	„ „	„
ডেনমার্কের রাজা	„	৩০০	„	১	„ „	„
ত্রিবাংকুরের রাজা	„	১৭	„	১	„ „	„
হায়দরাবাদের নিজাম	„	১৩	„	১	„ „	„
বরোদার গাইকবাড়	„	১৩	„	১	„ „	„
কাশ্মীরের মহারাজা	„	৫	„	১	„ „	„

এমন অনেক রাজাও ছিলেন যারা ২৲ টাকা রাজস্বের এক টাকা নিজের জন্য খরচ করতেলজ্জা পেতেন না। প্রজাদের ভালোমন্দের জন্য এঁরা মোটেই ব্যাকুল ছিলেন না। বৃটিশ গবর্মেণ্ট এঁদেরকে ভালোভাবেই চিনতো, তাই এদেশ থেকে চলে যাবার সময় এই সব রাজাদের নিয়ে এদেশে রাজন্য-স্থান প্রতিষ্ঠা করে যাবার চেষ্টা করে। সেই সুযোগে দেশীয় রাজারাও স্বাধীন হবার চেষ্টা করে। তখন পণ্ডিত জওহরলাল বলেন—আমরা কোন দেশীয় রাজ্যের স্বাধীনতা স্বীকার করবো না।

দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের সংখ্যা মোটামুটি ৯ কোটি ৩ লাখ, কিন্তু দেশ-শাসনের ব্যাপারে এদের কোন মতামত সামন্ত রাজারা গ্রাহ্য করতেন না। কিন্তু এযুগে এভাবে বেশীদিন চলে না, জওহরলালজী বললেন—প্রজাদের অধিকার মেনে নিতে হবে, এবং প্রজাদের সুখ-সুবিধার দিক থেকেই সমস্ত সমস্যার বিচার করতে হবে।

দেশ স্বাধীন হবার পর অবস্থা বদলে গেল।

জুনাগড় রাজ্যে ছিল কাথিয়াবাড়ের এক ক্ষুদে নবাব। প্রজাদের ইচ্ছা উপেক্ষা করে নিজের সুখ-সুবিধার জন্য তিনি গেলেন পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দিতে। প্রজারা প্রথমে প্রতিবাদ তুললো, তারপর করলো

বিদ্রোহ। শ্যামলদাস গান্ধীর নেতৃত্বে প্রজারা জুনাগড় দখল করে বসলো, ক্ষুদে-নবাব টাকা-পয়সা নিয়ে পালালো করাচীতে।

...কাশ্মীরের রাজারও হয়তো এই পরিণতিই ঘটতো, কিন্তু পাকিস্তানী সৈন্যরা হঠাৎ কাশ্মীর আক্রমণ করে বসলো, রাজ্য রাখার জন্য রাজাকে শেষ অবধি প্রজাদের অধিকার মেনে নিতে হোল, তবে ভারত সরকার সৈন্য পাঠালেন কাশ্মীর রক্ষা করতে।

...ত্রিবাংকুর ইতিমধ্যে ভারত সরকারের সঙ্গে যোগ দিল।

দেখতে দেখতে আরো অনেক সামন্ত রাজাই ভারত-সরকারের সঙ্গে যুক্ত হলো এবং প্রজাদের খুসি করার জন্য ইতিমধ্যেই অনেকে ভালো ভালো কথাও বলতে স্থুরু করলো।

ঢেনকানল, তালচের প্রভৃতি উড়িষ্যার ২১টি দেশীয় রাজ্য উড়িষ্যা প্রদেশের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে নিল, তাদের নিজস্ব আর কোন স্বাতন্ত্র্য রইল না।

গোলযোগ দেখা দিল হায়দরাবাদে। কাসিম রেজভির সংগঠনে একটি গুণ্ডা দল গড়ে উঠলো—'রাজকার দল'। তারা প্রজাদের উপর ব্যাপক অত্যাচার স্থুরু করলো। শেষে সর্দার প্যাটেল সৈন্য পাঠিয়ে হায়দরাবাদ রাজ্য ভারতভুক্ত করলেন। রেজভি পালিয়ে গেল পাকিস্তানে।

সর্দার প্যাটেলের চেষ্টায় সমস্ত দেশীয় রাজ্য ভারতের অন্তর্ভুক্ত হলো এবং সকলেই ভারতীয় প্রজা হিসাবে সমপর্যায়ভুক্ত হলো। সামন্ততান্ত্রিক ঔদ্ধত্যের শেষ হলো। তবে সামন্ত রাজারা একটা মোটা টাকা বার্ষিক ভাতা হিসাবে ভারত সরকারের কাছ থেকে পান, সেই টাকাটা প্রজা-সাধারণের কল্যাণে খরচ হলে সার্থক হতো।



কৃষক আন্দোলন

সামন্ত রাজাদের পরেই আসে বড় বড় জমিদারদের কথা। এক একজন জমিদার এক একটি ক্ষুদে রাজা। তাদের অন্যায়-অনাচার থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য কিষাণেরা একত্র হয়ে কিষাণ-সভা গড়ে তোলে। ১৯৩০-১ সালে এরা জমিদারী-প্রথা তুলে দেবার দাবী জানায়। জমিদাররাও মারমুখো হয়ে ওঠে। অনেক স্থানে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে কিষাণ-নেতাদের পক্ষে কোন কোন জমিদারের এলাকায় প্রবেশ করা কঠিন হয়ে পড়ে। দৃষ্টান্ত হিসাবে মংগলা, ববিলি, বেংকটগিরি, পৈঠাপুরম প্রভৃতি জমিদারীর নাম করা চলে।

অনেক জমিদার দুর্দান্ত প্রতাপে প্রজাদের উচ্ছেদ করার চেষ্টাও করেন, কিন্তু প্রজারা সাতপুরুষের ভিটে ছাড়তে চায় না।

বছর কয়েক আন্দোলন চলার পর শেষে অনেক জায়গায় চাষীদের সঙ্গে জমিদাররা আপোষ করতে বাধ্য হন। কিষাণ-সভা দাবী করেঃ ফসল যা হবে তার সিকি ভাগের বেশী তারা খাজনা দিতে পারবে না; টাকা ধার দিয়ে মহাজনরা সুদ নিয়ে তাদের সর্বস্বান্ত করে, মহাজনী কারবার

বন্ধ করে দেওয়া হোক, সরকার সমবায়-ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করুক, চাষীরা যাতে সেখান থেকে কম সুদে টাকা ধার পায়, তার ব্যবস্থা হোক।

অধিকাংশ প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলী এই নীতিগুলি মেনে নিয়েছেন, কিন্তু কাজ খুব তাড়াতাড়ি এগুচ্ছে না দেখে কিষাণেরা অধৈর্য হয়ে পড়ছে।

বাংলা দেশে কিষাণেরা 'তে-ভাগা' আন্দোলন সুরু করলো—জমির খাজনা তারা আধা-আধি দেবে না, দেবে তিনভাগের একভাগ। এই আন্দোলনে অনেককে জেলে যেতে হয়েছে, কিন্তু জেলখানার পাঁচিল মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তো আড়াল করে রাখতে পারে না। স্বাধীন ভারত সরকার এদের দাবী মেনে নিলেন এবং ঘোষণা করলেন যে, ১৯৪৮এর জুন-মাসের মধ্যেই জমিদারী-প্রথা লোপ করবেন। পরে ১৯৫৪ সালে বাংলা দেশে জমিদারী প্রথা বিলোপ করা হয় এবং গবর্মেণ্ট সমস্ত জমির মালিক হন। এখন আর জমিদার বলতে কেউ নেই। পঁচিশ বিঘার উপর জমি কেউ রাখতে পারবে না।

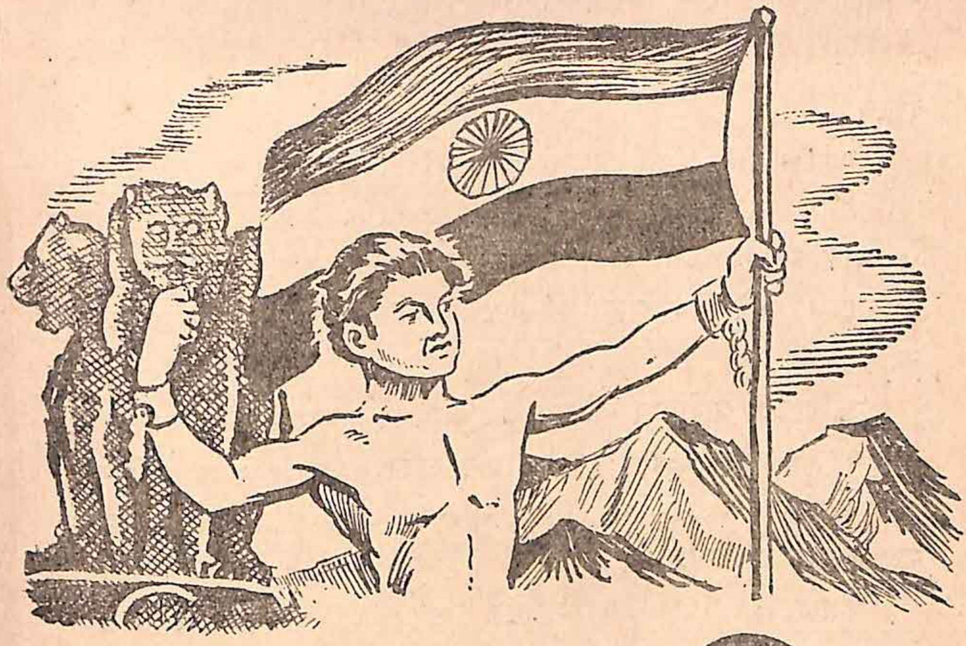
ইতিমধ্যে ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও এই নীতি চালু হয়ে গেছে।

কংগ্রেসের অধিবেশন

সাল	স্থান	সভাপতি	অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি
১৮৮৫	বোম্বাই	উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	?
১৮৮৬	কলিকাতা	দাদাভাই নৌরজী	রাজেন্দ্রলাল মিত্র
১৮৮৭	মাদ্রাজ	বদরুদ্দীন তায়েবজী	মাধব রাও
১৮৮৮	এলাহাবাদ	জর্জ ইউল	পণ্ডিত অযোধ্যানাথ
১৮৮৯	বোম্বাই	স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ	ফিরোজশা মেটা
১৮৯০	কলিকাতা	স্যার ফিরোজশা মেটা	মনোমোহন ঘোষ
১৮৯১	নাগপুর	আনন্দ চার্লু	নারায়ণ স্বামী নাইডু
১৮৯২	এলাহাবাদ	উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় [২য় বার]	পণ্ডিত বিশ্বম্ভরনাথ
১৮৯৩	লাহোর	দাদাভাই নৌরজী [২য় বার]	সর্দার দয়াল সিং
১৮৯৪	মাদ্রাজ	আলফ্রেড ওয়েব্	রংগিয়া নাইডু
১৮৯৫	পুণা	স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	এস, এম, ভিড়ে
১৮৯৬	কলিকাতা	মহম্মদ রহিমুতুল্লা সায়ানি	রমেশচন্দ্র মিত্র
১৮৯৭	বোম্বাই	চিত্তুর শংকরণ নায়ার	গণেশ খাপর্দে
১৮৯৮	মাদ্রাজ	আনন্দমোহন বসু	সুব্বারাও পন্তলু
১৮৯৯	লক্ষ্ণৌয়ের এক গ্রাম	রমেশচন্দ্র দত্ত	বংশীলাল
১৯০০	লাহোর	নারায়ণ গণেশ চন্দাবরকর	কালীপ্রসন্ন রায়
১৯০১	কলিকাতা	দীনশা এডুলজী ওয়াচা	জগদীন্দ্রনাথ রায়
১৯০২	আমেদাবাদ	স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় [২য় বার]	আম্বালাল দেশাই
১৯০৩	মাদ্রাজ	লালমোহন ঘোষ	সৈয়দ মোহম্মদ
১৯০৪	বোম্বাই	স্যার হেনরী কটন	ফিরোজশা মেটা
১৯০৫	কাশী	পুণ্যশ্লোক গোপালকৃষ্ণ গোখ্লে	মাধোলাল
১৯০৬	কলিকাতা	দাদাভাই নৌরজী [৩য় বার]	রাসবিহারী ঘোষ
১৯০৭	নাগপুর	রাসবিহারী ঘোষ	ত্রিভুবন দাস
১৯০৮	মাদ্রাজ	রাসবিহারী ঘোষ [২য় বার]	কৃষ্ণস্বামী
১৯০৯	লাহোর	মদনমোহন মালবীয়	হরকিষণলাল
১৯১০	এলাহাবাদ	স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ [২য় বার]	সুন্দরলাল
১৯১১	কলিকাতা	পণ্ডিত বিষণনারায়ণ ধর	ভূপেন্দ্রনাথ বসু
১৯১২	পাটনা	আর-এন-মুধলকর	মজরুল হক্
১৯১৩	করাচি	নবাব সৈয়দ মহম্মদ বাহাদুর	হরচন্দ্র বিষণদাস
১৯১৪	মাদ্রাজ	ভূপেন্দ্র নাথ বসু	সুব্রাহ্মণ্য আয়ার
১৯১৫	বোম্বাই	লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ	দীনশা ওয়াচা

সাল	স্থান	সভাপতি	অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি
১৯১৬	লক্ষৌ	অম্বিকাচরণ মজুমদার	জগৎনারায়ণ
১৯১৭	কলিকাতা	এনি বেশান্ত	বৈকুণ্ঠ নাথ সেন
১৯১৮	দিল্লী	পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় [২য় বার]	হাকিম আজমল খাঁ
—	বোম্বাই	[বিশেষ অধিবেশন] হাসান ইমাম	বিঠলভাই প্যাটেল
১৯১৯	অমৃতসর	পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু	স্বামী শ্রদ্ধানন্দ
১৯২০	কলিকাতা	[বিশেষ অধিবেশন] লালা লাজপত রায়	ব্যোমকেশ চক্রবর্তী
—	নাগপুর	বিজয়রাঘব আচার্য	যমুনালাল বাজাজ
১৯২১	আমেদাবাদ	হাকিম আজমল খাঁ	বিঠলভাই প্যাটেল
১৯২২	গয়া	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ	ব্রিজকিশোর প্রসাদ
১৯২৩	দিল্লী	[বিশেষ অধিবেশন] আবুল কালাম আজাদ	ডাঃ মোহম্মদ আলি আন্সারী
—	কোকনদ	মৌলানা মোহম্মদ আলি	কোণ্ডা বেংকটাপ্পা
১৯২৪	বেলগাঁও	মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী	দেশপাণ্ডে
১৯২৫	কানপুর	শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু	মুরারীলাল
১৯২৬	গৌহাটি	শ্রীনিবাস আয়েংগার	তরুণরাম ফুকন
১৯২৭	মাদ্রাজ	ডাঃ মোহম্মদ আলি আনসারি	মুদালিয়র
১৯২৮	কলিকাতা	পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু [২য় বার]	যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত
১৯২৯	লাহোর	পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু	ডাঃ কিচ্লু
১৯৩০	[কোন অধিবেশন হয়নি]		
১৯৩১	করাচি	সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল	গিদওয়ানি
১৯৩২	দিল্লী	শেঠ রণছোড়দাস অমৃতলাল	?
১৯৩৩	কলিকাতা	শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা	?
১৯৩৪	বোম্বাই	ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ	কে, এফ, নরীম্যান
১৯৩৫	[কোন অধিবেশন হয়নি]		
১৯৩৬	লক্ষৌ	পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু [২য় বার]	?
১৯৩৭	ফৈজপুর গ্রাম	পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু [৩য় বার]	?
১৯৩৮	হরিপুরা গ্রাম	নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু	দরবার গোপালদাস
১৯৩৯	ত্রিপুরী গ্রাম	নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু পরে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ	?
১৯৪০	রামগড়	মৌলানা আবুল কালাম আজাদ [২য় বার]	?
১৯৪১	[কোন অধিবেশন হয়নি]		
১৯৪২		ঐ	
১৯৪৩		ঐ	
১৯৪৪		ঐ	
১৯৪৫		ঐ	
১৯৪৬	?	পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু [৪র্থ বার]	?
১৯৪৭	মীরাট	আচার্য জীবৎরাম ভগবানদাস কৃপালনী পরে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ	?

* ১৯৪৭-১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। তখন থেকে কংগ্রেসের সংগ্রামের পর্ব শেষ হয়, এবং সুরু হয় পুনর্গঠনের কাজ, সংগ্রামের ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটে সেইখানেই।



স্বাধীনতার প্রতিজ্ঞা

“আমরা বিশ্বাস করি যে, আত্মবিকাশের পূর্ণ সুযোগ প্রাপ্তির জন্য অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের ন্যায় ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতা লাভ করিবার ও স্বীয় শ্রমার্জিত বিত্ত ভোগ করিবার এবং জীবন ধারণের উপযোগী সর্বপ্রকার উপকরণ পাইবার অবিচ্ছেদ্য অধিকার রহিয়াছে। আমরা আরো বিশ্বাস করি যে, যদি কোন গবর্মেণ্ট কোন জাতিকে এই সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখে এবং তাহাকে নির্যাতন করে, তবে সেই গবর্মেণ্টের পরিবর্তন বা উচ্ছেদ সাধন করিবার অধিকারও সেই জাতির আছে। ভারতে বৃটিশ গবর্মেণ্ট ভারতবাসীদিগকে শুধু স্বাধীনতা হইতেই বঞ্চিত করে নাই। অধিকন্তু জনসাধারণের শোষণের উপর আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক সর্বনাশ সাধন করিয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষকে

বৃটিশ সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া পূর্ণ স্বরাজ অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতালাভ করিতে হইবে।

"আমরা স্বীকার করি যে, আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের প্রকৃষ্টতম পন্থা হিংসানীতি নয়। ভারতবর্ষ শান্তিপূর্ণ ও বৈধ উপায়ে যথেষ্ট শক্তি ও আত্মবিশ্বাস অর্জন করিয়াছে এবং স্বরাজ-লাভের পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। এই পথ অনুসরণ করিলেই আমাদের দেশ স্বাধীনতা লাভ করিবে।

"ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আমরা নূতন করিয়া পণ লইতেছি, এবং যতদিন না ভারতবর্ষে পূর্ণ স্বরাজ লাভ হয়, ততদিন ধরিয়া অহিংসার পথে স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত করিবার জন্য গভীর নিষ্ঠা সহকারে সংকল্প গ্রহণ করিতেছি।

"আমাদের বিশ্বাস যে, সাধারণ ভাবে অহিংস কর্মপ্রচেষ্টা এবং বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ অহিংস সংগ্রামের আয়োজনের নিমিত্ত আজ দেশের সমক্ষে উপস্থিত ও কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত গান্ধীজীর গঠনমূলক কার্যক্রম সাফল্যের সহিত কার্যকরী করা প্রয়োজন। বিশেষতঃ খাদি, সাম্প্রদায়িক সমন্বয়, এবং অস্পৃশ্যতাবর্জন, জাতিধর্ম-নির্বিশেষে আমাদের দেশবাসীর মধ্যে সদিচ্ছা প্রচারের জন্য আমরা প্রতিটি সুযোগের অন্বেষণে থাকিব। যাহাদের অবহেলা করা হইয়াছে, তাহাদের অজ্ঞতা ও দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য আমরা চেষ্টা পাইব এবং যাহারা অনুন্নত ও অনগ্রসর বলিয়া বিবেচিত হয়, আমরা সর্বপ্রকারে তাহাদের অধিকার রক্ষার জন্য সচেষ্ট হইব।

"আমরা জানি যে, যদিও সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করিতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তথাপি সরকারী অথবা বে-সরকারী কোন ইংরেজের সহিত আমাদের কলহ নাই। আমরা জানি যে, বর্ণহিন্দু ও হরিজনদের মধ্যে যে সকল বৈষম্য আছে তাহা দূর করিতেই হইবে এবং হিন্দুদিগকে বিশ্বাস করিতেই হইবে যে তাহাদের দৈনন্দিন ব্যবহার ও কার্য-কলাপে ঐ সকল বৈষম্য অহিংস আচরণের পক্ষে বাধাস্বরূপ। আমাদের ধর্মমত পৃথক হইতে

পারে, কিন্তু আমরা সকলে একই ভারত-মাতার সন্তান—পরস্পরের সহিত একই জাতীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ, এবং একই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থে জড়িত। সুতরাং কার্যক্ষেত্রে আমরা পরস্পরের প্রতি তদনুরূপ প্রীতিপূর্ণ আচরণ করিব।

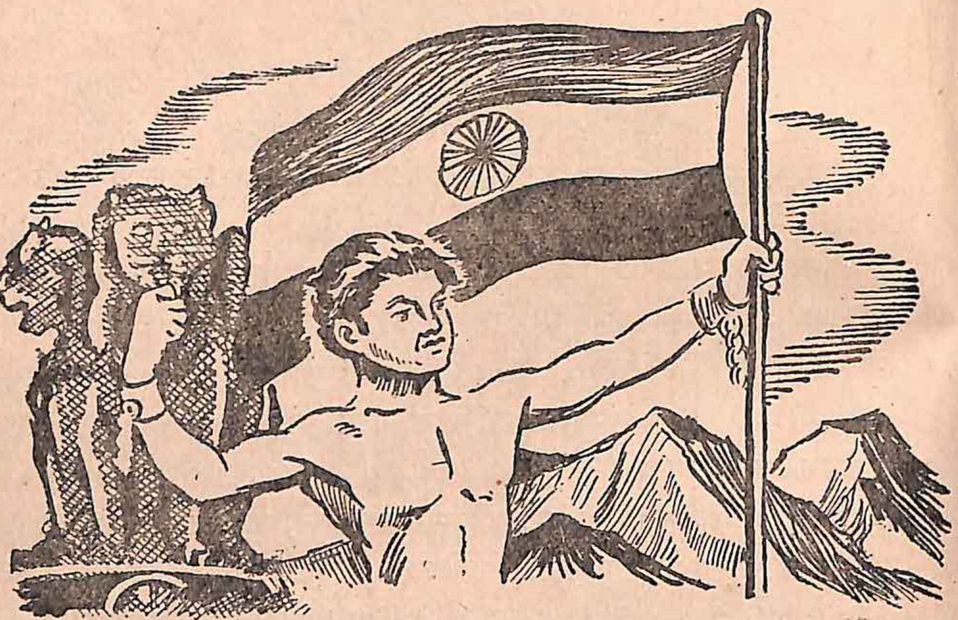
"ভারতের সাত লক্ষ গ্রামের পুনর্গঠন এবং জনগণকে দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ হইতে মুক্ত করিবার জন্য চরকা ও খাদি আমাদের গঠনমূলক কার্য-ক্রমের অপরিহার্য অঙ্গ। অতএব নিজের নিত্য ব্যবহার্য বস্ত্রের জন্য খাদি ব্যতীত অপর কিছু ব্যবহার করিব না, যতদূর সম্ভব একমাত্র কুটীর-শিল্পজাত দ্রব্যাদি ব্যবহার করিব এবং অপরে যাহাতে সেইরূপ করে তাহার চেষ্টা করিব। গঠনমূলক কার্যক্রমের এক অথবা একাধিক অঙ্গকে কার্যকরী করিবার জন্য আমরা যথাশক্তি চেষ্টা করিব।

"যাঁহারা বিগত সংগ্রামে কঠিন দুর্গতির সম্মুখীন হইয়াছেন, লাঞ্ছনা বরণ করিয়াছেন এবং স্ব স্ব জীবন ও ধনসম্পত্তি বিসর্জন দিয়াছেন আমরা সকৃতজ্ঞচিত্তে সেই সহস্র সহস্র সহকর্মীর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। তাঁহাদের ত্যাগ আমাদের সর্বদা এই কর্তব্যই স্মরণ করাইয়া দিবে যে অভীষ্ট সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের বিশ্রাম নাই।

"আমরা নিখিল ভারত জাতীয় মহাসভা কর্তৃক ১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট তারিখের গৃহীত প্রস্তাব পুনরায় সমর্থন করিতেছি। ইহাতে ভারত ও বিশ্বের কল্যাণের জন্য এবং সকলের মুক্তির জন্য ভারতবর্ষ হইতে অবিলম্বে ইংরেজ-শাসনের অপসরণ দাবী করা হইয়াছে।

"আজ আমরা পুনরায় প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমরা শৃঙ্খলার সহিত কংগ্রেসের নীতি ও নিয়মানুবর্তিতা পালন করিব এবং কংগ্রেসের আহ্বানে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিব।

বন্দে মাতরম্!"



স্বাধীনতার আদর্শ

১৯৪৭ সালের ২২শে জানুয়ারী ভারতীয় গণপরিষদে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু স্বাধীন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শ কি হবে তা ঘোষণা করেন। তিনি যা বলেন, তার মোটামুটি কথা হচ্ছে :

ভারতবর্ষ হবে এক স্বাধীন সার্বভৌম সাধারণতন্ত্র। এবং—

ভারতের সব জায়গার প্রতিনিধিরা আছেন গণপরিষদে, তাঁরাই এদেশের নূতন শাসনতন্ত্র তৈরি করবেন। এবং—

এদেশের যে-সব এলাকা এখন ইংরেজরা শাসন করছেন, যে সব অঞ্চলে সামন্ত রাজারা রাজ্য করেন, আর যে সব অঞ্চল বৃটিশ-ভারত ও সামন্ত-রাজ্যের বাইরে রয়েছে, তাদের সবাইকে নিয়েই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হবে। তাছাড়া যে সব অঞ্চল ভারতীয় স্বাধীন সার্বভৌম সাধারণ-তন্ত্রের সঙ্গে যোগ দিতে চাইবে তাদেরকেও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে নেওয়া হবে। এবং—

ভারতীয় গণপরিষদ ইউনিয়ন-সরকারের হাতে যে সমস্ত ক্ষমতা ছেড়ে দেবেন, সেই সমস্ত ক্ষমতা ছাড়া, প্রত্যেকটি অঞ্চলই নিজ নিজ এলাকার মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করবে। এবং—

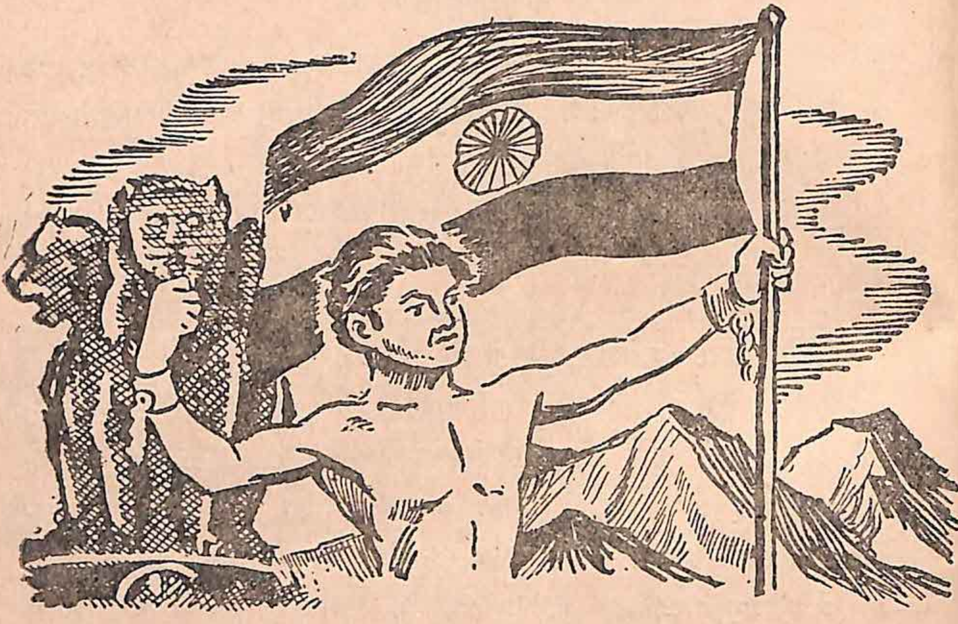
স্বাধীন ভারতের সমস্ত অঞ্চলের শাসন-কার্যের সব কিছু ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব জনসাধারণের কাছ থেকেই পাওয়া গেছে বলে গণ্য করা হবে। এবং—

স্বাধীন ভারতে সকল শ্রেণীর লোক সামাজিক, বৈষয়িক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়-বিচার লাভ করবে। আইনের চোখে সবাই সমান মর্যাদা ও সুযোগ পাবে। স্বাধীন-ভারতের আইন সমাজ ও নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চিন্তায় ও বাক্যে, উপাসনা ও ধর্ম-বিশ্বাসে, বৃত্তি ও সভাসমিতি-অনুষ্ঠানে প্রত্যেক নাগরিকেরই স্বাধীনতা থাকবে। এবং—

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, অনুন্নত শ্রেণী ও অনগ্রসর জাতির জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। এবং—

সভ্যজাতির ন্যায় ও নীতি অনুযায়ী জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে স্বাধীন ভারতের সার্বভৌম অধিকার থাকবে। এবং—

আমাদের এই প্রাচীন দেশ জগৎ-সভায় যোগ্য মর্যাদা লাভ করার চেষ্টা করবে, এবং বিশ্বের শান্তি ও মানবজাতির কল্যাণের জন্য স্বেচ্ছায় সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করবে।…



স্বাধীনতার রূপ

১৯৪৭ সালের জুন মাসে বিলাতের পার্লামেণ্টে 'ভারতীয় স্বাধীনতা বিল' নামে একটি আইন পাস হয়, তাতে ১৫ই আগস্ট থেকে ভারতবর্ষ স্বাধীন, রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে। এই আইনের মোটামুটি কথা হচ্ছে :

ভারতভূমিকে দু'ভাগে ভাগ করা হোল—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান।

বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবকে দু'ভাগে ভাগ করা হোল—পশ্চিমবঙ্গ আর পূর্ব-পাঞ্জাব ভারতবর্ষে যুক্ত হোল, পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম পাঞ্জাব যোগ দিল পাকিস্তানে।

ক্যানেডা, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকাতে যেমন ডোমিনিয়ন স্টেটাস্ আছে ভারতবর্ষকেও তাই দেওয়া হোল—সব বিষয়ে স্বাধীন হলেও নামে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরেই রইল। তবে মনে করলে এই দুটি রাজ্য যে

কোন সময় পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে যেতে পারে।

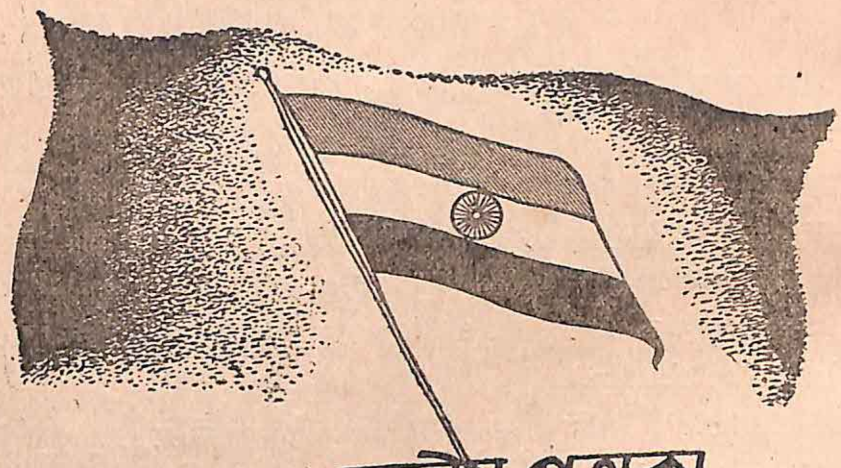
১৫ই আগস্ট ১৯৪৭-এর পর থেকে ভারতবর্ষ কিংবা পাকিস্তানের উপর শাসন করার কোন অধিকার বৃটিশ পার্লামেণ্টের রইল না।

বৃটিশ সম্রাটের উপাধি বদলে গেল, 'ভারত সম্রাটের' (Emperor of India) বদলে হোল,—'ভারত ও পাকিস্তান রাজ্যের রাজা' (King of India & Pakistan.)

বড়লাটের উপাধি ছিল 'রাজপ্রতিনিধি ও ভারতের বড়লাট' (Viceroy and Governor General of India) এখন থেকে 'রাজ প্রতিনিধি' কথাটা উঠে গেল, কেবল 'ভারতের বড়লাট' কথাটা রইল।

ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানে দুইটি গণ-পরিষদ স্থাপিত হয়েছে, তারাই এই দুই রাজ্য শাসন করার জন্য আইন-কানুন তৈরি করছে।

দেশীয় রাজ্যের উপর বৃটিশ গবর্মেণ্টের যে ক্ষমতা ও সার্বভৌমতা ছিল এতদিনে তা লোপ পেল, দেশীয় রাজারা স্বাধীনতা পেলেন, কিন্তু এইসব রাজ্যকে নিরাপত্তা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার জন্য ভারতবর্ষ অথবা পাকিস্তানের সঙ্গে যোগদান করতে অনুরোধ করা হয়েছে।



জাতীয় পতাকা

সারা ভারতের কোন জাতীয় পতাকা ছিল না, তবে কোন কোন রাজ্যের নিজস্ব পতাকা ছিল, যেমন শিবাজীর ছিল গৈরিক পতাকা—'ভাগোয়া ঝাণ্ডা', টিপুসুলতানের ছিল বাঘ-আঁকা নিশান। ইংরেজরা নিজেদের 'ইউনিয়ন জ্যাক্' এতদিন এদেশেও উড়াচ্ছিল, এখন তিনরঙা নিশান তার স্থান দখল করেছে।

আমাদের এই পতাকার পরিকল্পনা হয় ভারতের বাইরে। ১৯০৫ সালে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে মাদাম কামা ও আরো ক'জন ভারতীয় মিলে স্থির করলেন যে ভারতের নিজস্ব একটি পতাকা থাকা উচিত—নিশানটি হবে তিন রংয়ের : জাফরাণ, শাদা, ও সবুজ। জাফরাণ রঙের মধ্যে আঁকা থাকবে আটটি পদ্ম, মাঝের শাদা অংশে লেখা থাকবে—বন্দেমাতরম্, নীচের সবুজ রঙের বাঁ দিকে থাকবে সূর্য আর ডানদিকে চন্দ্র। এই নিশান কিন্তু এদেশে চলেনি।

১৯১৬ সালে এদেশের ক'জন নেতা আরেক রকম নিশানের পরিকল্পনা করলেন, তাতে পর পর নয়টি রঙ্ থাকবে—পাঁচটি লাল রঙের রেখা আর চারটি সবুজ রঙের রেখা। উপরে বাঁদিকে থাকবে ইউনিয়ন-জ্যাক আর নীচে থাকবে সপ্তর্ষি-মণ্ডলের সাতটি তারা। এ পতাকাও এদেশে চলেনি।

১৯২১ সালে গান্ধীজী এক পতাকার পরিকল্পনা করেন, তাতে তিনটি রঙ্ ছিল ঃ সাদা, সবুজ ও লাল। শাদা সর্ব ধর্মের প্রতীক, লাল হিন্দুর প্রতীক, মাঝে সবুজের উপর আঁকা থাকবে চরকা—স্বাবলম্বনের প্রতীক। পতাকাটি হবে খদ্দরের। এই পতাকা এদেশে বছর দশেক চলে।

১৯৩১ সালে কংগ্রেসী নেতারা এক-রঙা নিশানের পরিকল্পনা করেন ঃ সমস্ত পতাকাটি হবে গেরুয়া রঙের। উপরে বাঁদিকের কোণে থাকবে একটি চরকা। এ পতাকাও এদেশে চলেনি।

এই বছরেই গান্ধীজী আবার নূতন পতাকার পরিকল্পনা করেন ঃ গৈরিক, শাদা ও সবুজ। গৈরিক সাহস ও ত্যাগের প্রতীক, শাদা শান্তি ও সত্যের প্রতাক, সবুজ শৌর্য ও বিশ্বাসের প্রতীক, মাঝে শাদার উপর আঁকা রইল চরকা—স্বাবলম্বনের প্রতীক। স্থির হোল পতাকা চওড়ায় যতখানি হবে লম্বায় হবে তার দেড়গুণ। এই পতাকা এদেশের সর্বত্র গৃহীত হয়েছিল, এবং অনেক শহীদ এই পতাকার সম্মানের জন্য প্রাণ দিয়েছেন। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ভারতের মাটিতে এই পতাকাই উড়িয়েছিলেন।

১৯৪৭ সালে গণপরিষদ স্বাধীন ভারতের জন্য এক পতাকার পরিকল্পনা করেন, তাতে ১৯৩১ সালের পতাকাই বহাল থাকে, মাঝে চরকার স্থলে 'অশোক চক্র' আঁকা হয়। সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সময় ভারতের নানা স্থানে অশোক-স্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন। সেই সব স্তম্ভের গায়ে যে চক্র উৎকীর্ণ করা আছে, সেটাই হোল 'অশোক-চক্র'।

মহাত্মা গান্ধী বলেন—'এই চক্র চরকার চাকার প্রতীক। চাকা সামনে গড়িয়ে যায়, সুতরাং এই চক্র উন্নতি ও প্রগতির চিহ্ন। ধর্মের ও ন্যায় শাসনের প্রতীকও এই চক্র। এই চক্রের ভিতরের রেখাগুলি সূর্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, সুতরাং এটা প্রাণের ও আলোর চিহ্ন।'

পণ্ডিত জওহরলাল বলেন—'এই পতাকা সাম্রাজ্য বা সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক নয়—অন্যের উপর প্রভুত্ব বিস্তারের ইচ্ছাও এতে প্রকাশ পায়নি, এই পতাকা স্বাধীনতার প্রতীক—শুধু আমাদের স্বাধীনতা নয়, পৃথিবীর

সর্বজনের স্বাধীনতার নিদর্শন, যেখানে ভারতবাসী আছেন বা যেখানে ভারতীয় প্রতিনিধিরা আছেন, শুধু সেখানেই এই পতাকা থাকবে না,—দূর-দূরান্তরে, মহাসমুদ্র অতিক্রম করে, যেখানেই ভারতীয় নৌবহর উপস্থিত হবে এই পতাকা সেখানেই সগৌরবে উড়বে। এই পতাকা স্বাধীনতা ও মৈত্রীর প্রতীক হয়ে থাকবে। পৃথিবীর সকল দেশকে একটি কথা জানিয়ে দেবে যে ভারতবর্ষ সকলের বন্ধুত্ব কামনা করে এবং স্বাধীনতাকামী সকল দেশকেই সাহায্য করতে ইচ্ছুক।'

পৃথিবীর আর কোন দেশের জাতীয় পতাকার এমন সুন্দর ব্যাখ্যা নেই।

নিশান তোলার গান :—

ঝণ্ডা উঁচা রহে হমারা
বিজয়ী বিশ্ব তিরংগা প্যারা'
ঝণ্ডা উঁচা রহে হমারা—।
সদা শক্তি বরষাণে-বালা
প্রেম-সুধা সরসানে-বালা,
বীরোঁকো হরষাণে-বালা
ঝণ্ডা উঁচা রহে হমারা—।
স্বতন্ত্রতাকে ভীষণ রণমেঁ
লখ করে বঢ়ে জোশ ক্ষণ-ক্ষণমেঁ
কাঁপে শত্রু দেখ্ কর মনমে,
মিট্ যায়ে ভয় সংকট সারা
ঝণ্ডা উঁচা রহে হমারা—।
ইস্ ঝণ্ডেকে নীচে নির্ভয়
লে স্বরাজ্য ইহ অবিচল নিশ্চয়
বোলো—'ভরত-মাতাকী জয়,'

স্বতন্ত্রতা হো ধ্যেয় হমারা
ঝণ্ডা উঁচা রহে হমারা—।
আও প্যারে বীরোঁ আও
দেশ ধর্ম পর্ বলি বলি যাও,
এক সাথ্ সব মিলকর গাও
—প্যারা ভারত দেশ হমারা—
ঝাণ্ডা উঁচা রহে হমারা !
ইস্‌কী শান ন জানে পাবে
চাহে জান ভলে হী যাবে
বিশ্ব বিজয় করকে দিখ্‌লাবে
তব্ হোবে পণ পূর্ণ হমারা
ঝণ্ডা উঁচা রহে হমারা ॥

জাতীয় সংগীত

॥ ১ ॥

বন্দেমাতরম্

"বন্দেমাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জ-শীতলাম্
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্,
ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।
সপ্তকোটিকণ্ঠ-কলকল-নিনাদ-করালে,
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃত খর করবালে।
অবলা কেন মা এত বলে!
বহু বলধারিণীং নমামি তারিণীং,
রিপুদল-বারিণীং মাতরম্।"
তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম,
তুমি হৃদি, তুমি মর্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারি প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ-ধারিণী,
কমলা কমল-দল-বিহারিণী,
বাণী বিদ্যাদায়িনী
নমামি ত্বাং,

নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং,
সুজলাং সুফলাং মাতরম্ !
বন্দে মাতরম্
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং
ধরণীং ভরণীং মাতরম্।

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

॥ ২ ॥

জনগণ-মন-অধিনায়ক

জনগণ-মন-অধিনায়ক জয় হে, ভারত-ভাগ্য-বিধাতা।
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ,
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি-তরঙ্গ,
তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশীস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণ-মঙ্গল-দায়ক জয় হে, ভারত-ভাগ্য-বিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয়, জয়, জয় হে ॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' সংগীতের সবটাই আগে জাতীয় সংগীত হিসাবে গাওয়া হতো। পরে মুসলীম লীগ আপত্তি তোলায় প্রথম বারো লাইন মাত্র জাতীয় সংগীত হিসাবে রাখা হয়, পরের অংশটুকু বাদ যায়। এবং দ্বিতীয় জাতীয় সংগীত হিসাবে রবীন্দ্রনাথের 'জনগণ-মন-অধিনায়ক'-এর প্রথম সাত লাইন গৃহীত হয়।

স্বাধীন ভারতের প্রথম লাটসাহেব ও মন্ত্রীগণ

বড়লাট—লর্ড লুই ফ্রানসিস্ এলবার্ট ভিক্টর নিকোলাস মাউন্টব্যাটেন।
প্রধান মন্ত্রী—পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু (বৈদেশিক দপ্তর)
অন্যান্য মন্ত্রীগণ—সর্দার বল্লভ-ভাই প্যাটেল (স্বায়ত্ত, বেতার ও সামন্তরাজ্য দপ্তর)

জয়রামদাস দৌলতরাম (কৃষি ও খাদ্য দপ্তর)
মৌলানা আবুল কালাম আজাদ (শিক্ষা ও চারুকলা)
ডক্টর জন মাথাই (যানবাহন ও রেলপথ)
সর্দার বলদেও সিং (দেশরক্ষা)
জগজীবন রাম (শ্রম)
সি. এইচ. ভাবা (বাণিজ্য)
রফি আমেদ কিদোয়াই (চলাচল)
রাজকুমারী অমৃত কাউর (স্বাস্থ্য)
ডক্টর বি. আর. আম্বেদকর (আইন)
ডক্টর এস. কে. যন্মুখম চেট্টি (অর্থ)
ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (শিল্প ও সরবরাহ)
ডক্টর এন. ডি. গ্যাডগিল (খনি ও বিদ্যুৎশক্তি)
কে. সি. নিয়োগী (বাস্তুত্যাগীদের সাহায্য ও পুনর্বসতি)
গোপালস্বামী আয়েঙ্গার (দপ্তরহীন)

প্রাদেশিক

পশ্চিম বাংলা ঃ লাটসাহেব—চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীয়া।
প্রধান মন্ত্রী—ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (শিক্ষা ও স্বায়ত্ত শানস)

অন্যান্য মন্ত্রী ঃ

ডাক্তার সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	হেমচন্দ্র নস্কর
কমলকৃষ্ণ রায়	কালীপদ মুখোপাধ্যায়
মোহিনীমোহন বর্মন	অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী
চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী	ভূপতি মজুমদার

এই মন্ত্রীসভা ভেঙে ২৩শে জানুয়ারী '৪৮ তারিখে নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হয় ঃ

প্রধান মন্ত্রী—ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়

অন্যান্য মন্ত্রী ঃ

নলিনীরঞ্জন সরকার	প্রফুল্লচন্দ্র সেন
হরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী	কালীপদ মুখোপাধ্যায়
ভূপতি মজুমদার	হেমচন্দ্র নস্কর
মোহিনীমোহন বর্মণ	যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা
নিকুঞ্জবিহারী মাইতি	বিমলচন্দ্র সিংহ
নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার	কিরণশংকর রায়

আসাম ঃ লাটসাহেব—স্যার আকবর হায়দারী

প্রধান মন্ত্রী—গোপীনাথ বড়দলৈ

অন্যান্য মন্ত্রী ঃ

বিষ্ণুরাম মেধী	আবদুল মতলিব মজুমদার
অমিয়কুমার দাস	রেভারেণ্ড জে.জে.এস. নিকোলাস রায়
রামনাথ দাস	ভীমবর দিউড়ী
রূপনাথ ব্রহ্ম	মহম্মদ তায়েবুল্লা

উড়িষ্যা ঃ লাটসাহেব—ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু

প্রধান মন্ত্রী—হরেকৃষ্ণ মহাতপ

অন্যান্য মন্ত্রী ঃ

নবকৃষ্ণ চৌধুরী	পণ্ডিত লিঙ্গরাজ মিশ্র
নিত্যানন্দ কানুনগো	রাধাকৃষ্ণ বিশ্বাস রায়

বিহার ঃ লাটসাহেব—মাধব শ্রীহরি আনে

প্রধান মন্ত্রী—শ্রীকৃষ্ণ সিংহ

অন্যান্য মন্ত্রী ঃ

অনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ	ডক্টর সৈয়দ মামুদ
জগলাল চৌধুরী	রামচরিত্র সিংহ
বদ্রিনাথ বর্মা	কৃষ্ণবল্লভ সহায়
পণ্ডিত বিনোদানন্দ ঝাঁ	আবদুল কোয়াউম আনসারী

যুক্তপ্রদেশ ঃ লাটসাহেব—শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু

প্রধান মন্ত্রী—পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ

অন্যান্য মন্ত্রী ঃ

হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম	সম্পূর্ণানন্দ
ঠাকুর হুকুম সিং	এন. এ. শেরওয়ানি
চৌধুরী গিরিধারীলাল	এ. জি. খের
সি. বি. গুপ্ত	লাল বাহাদুর শাস্ত্রী
কেশবদেও মালবীয়	শ্রীকৃষ্ণদত্ত পালিওয়াল

মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ঃ লাটসাহেব—মঙ্গলদাস পাকবাসা

প্রধান মন্ত্রী—রবিশংকর শুক্ল

অন্যান্য মন্ত্রী ঃ

পণ্ডিত দ্বারকাপ্রসাদ মিশ্র	দুর্গাশংকর কৃপাশংকর মেটা
আর. কে. পাতিল	ডক্টর এস. ডবলু. বরলিঙ্গেয়
রামেশ্বর অগ্নিভোজ	বি. এ. দেশমুখ

বোম্বাই ঃ লাটসাহেব—রাজা স্যার মহারাজ সিং

প্রধান মন্ত্রা—বি. বি. খের

অন্যান্য মন্ত্রী ঃ

মোরারজী আর. দেশাই	ডাক্তার এম. ডি. ডি. গিল্ডার
এল. এম. পাতিল	দিনকর রাও এন্. দেশাই
বৈকুণ্ঠ এন্, মেটা	গুলজারিলাল নন্দ

এম. পি. পাতিল — জি. ডি. বর্তক

জি. ডি. তাপসে

মাদ্রাজ : লাটসাহেব—লেফ্‌টেন্যাণ্ট জেনারেল স্যার আর্চিবল্ড এডওয়ার্ড নাই

প্রধান মন্ত্রী—সি. পি. রামস্বামী রেড্ডিয়ার

অন্যান্য মন্ত্রী :

ডক্টর এস. এস. রাজন্ — ডক্টর পি. সুব্বারাও

এম. ভক্তবৎসলম্ — সীতারাম রেড্ডিয়ার

কে. চন্দ্রমৌলি — বি. গোপাল রেড্ডি

কে. মাধব মেনন

পূর্ব পাঞ্জাব : লাটসাহেব—স্যার চণ্ডুলাল ত্রিবেদী

প্রধান মন্ত্রী—ডাক্তার গোপীচাঁদ ভার্গব

অন্যান্য মন্ত্রী :

সর্দার শরণ সিং — ক্যাপ্টেন চৌধুরী রণজিৎ সিং

চৌধুরী লহরী সিং — সর্দার প্রতাপ সিং

সর্দার ঈশ্বর সিং মুঝম্ — পৃথ্বী সিং আজাদ

বিদেশে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত :

আমেরিকা—আসফ আলি — ইংলণ্ড—কৃষ্ণ মেনন

রুশিয়া—বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত — আফগানিস্থান—ডাক্তার তারাচাঁদ

রাষ্ট্রসঙ্ঘে—পি. সি. পিল্লাই — সুইট্‌জারল্যাণ্ড—ধীরাজলাল দেশাই

তুরস্ক—দেওয়ান চমনলাল

পাকিস্তানের বড়লাট ও মন্ত্রীগণ :

বড়লাট—কায়দে আজম মহম্মদ আলি জিন্না

প্রধান মন্ত্রী—লিয়াকৎ আলি খাঁ (বৈদেশিক, শিক্ষা ও দেশরক্ষা দপ্তর)

অন্যান্য মন্ত্রী :

গোলাম মহম্মদ (অর্থ) গজনফর আলি খাঁ (খাদ্য, কৃষি ও স্বাস্থ্য)
সর্দার আবদুর রব নিস্তার (চলাচল) যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল (আইন ও শৃঙ্খলা)
ফজলুর রহমন (স্বায়ত্ত শাসন, সংবাদ ও শিক্ষা)

প্রাদেশিক—

পূর্ববঙ্গ : লাটসাহেব—স্যার ফ্রেডারিক বোর্ণ

প্রধান মন্ত্রী—খাজা নাজিমুদ্দিন

অন্যান্য মন্ত্রী :

নুরুল আমিন হামিদুল হক্
আবদুল হামিদ হাসান আলি,
সৈয়দ মোহম্মদ আফজল মোহম্মদ হবিবুল্লাহ বাহার

পশ্চিম পাঞ্জাব : লাটসাহেব—স্যার ফ্রান্সিস্ মুডী

প্রধান মন্ত্রী—খান ইখতিখার হোসেন খাঁ

অন্যান্য মন্ত্রী :

মিয়া মমতাজ দৌলতানা সর্দার শওকৎ হায়েৎ খাঁ
শেখ কেরামৎ আলি

সিন্ধু : লাটসাহেব—গোলাম হোসেন হেদায়েতুল্লাহ্

প্রধান মন্ত্রী—এম. কে. খুরো

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত : লাটসাহেব—স্যার জর্জ কানিংহাম

প্রধান মন্ত্রী—খান আবদুল কায়ুম খাঁ

স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনা করতে সময় লাগে, ততদিন বড়লাটই দেশের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। নতুন সংবিধান গৃহীত হয় ১৯৫০ সালে, তখন বড়লাটের পদ লোপ পায় ও রাষ্ট্রপতি পদের সৃষ্টি হয়। ভারতবাসী তাদের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেন—ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদকে। নতুন নির্বাচন হয়ে নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে ভারতীয় পার্লামেন্ট—'লোকসভা' গঠিত হয় এবং সর্বত্রই নতুন শাসনতন্ত্র চালু হয়।

খণ্ডিত ভারত

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রদেশ ঃ

বোম্বাই (পরে গুজরাট ও মহারাষ্ট্র)
মাদ্রাজ (পরে অন্ধ্র ও আসাম)
পশ্চিম বঙ্গ
আসাম
বিহার
উত্তর প্রদেশ
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার
পূর্ব পাঞ্জাব
উড়িষ্যা
দিল্লী
আজমীড় মাড়ওয়ারা
(পরে রাজস্থান)
কুর্গ
আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ
পন্থ পিপলোদা

পশ্চিমবঙ্গের জেলা ঃ

কলিকাতা, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, ২৪ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, দার্জিলিং।
(পুরুলিয়া পরে যুক্ত হয়েছে)

পাকিস্তানের প্রদেশ ঃ

পূর্ববঙ্গ
পশ্চিম পাঞ্জাব
সিন্ধু
সীমান্ত প্রদেশ
বেলুচিস্থান

পূর্ব বঙ্গের জেলা ঃ

চট্টগ্রাম—চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম-পার্বত্য অঞ্চল, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট।

রাজসাহী—রাজসাহী, রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা, বগুড়া, খুলনা, যশোহর, নদীয়া।

ঢাকা—ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিং, বাখরগঞ্জ।

বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ঃ

আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তর প্রদেশ, পূর্ব-পাঞ্জাব, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মধ্য-প্রদেশ, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, মহীশূর, রাজস্থান, অন্ধ্র, কেরল, জম্মু ও কাশ্মীর, নাগা ভূমি।

দিল্লী, হিমাচল, মণিপুর, ত্রিপুরা, আন্দামান-নিকোবর, লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয়, আমনদিবি, দাদরা ও নগরহাভেলি, গোয়া-দমন-দিউ, পণ্ডিচেরী ও উত্তর-পূর্ব-সীমান্ত (নেফা) অঞ্চল।

স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্রের কথা

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট আমরা স্বাধীনতা লাভ করি, তারপর স্বাধীনদেশের শাসনতন্ত্র রচিত হয়, সেই শাসনতন্ত্র গৃহীত হয় ২৬শে জানুয়ারী ১৯৫০ সালে। প্রত্যেক ভারতীয়েরই সেই শাসনতন্ত্রের নীতিগুলি মোটামুটিভাবে জানা থাকা ভাল ঃ

ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

সামাজিক, অর্থনীতিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে প্রত্যেক ভারতীয়ের সমান সুবিধা ভোগের অধিকার আছে।

চিন্তা-ভাবনা, মতামত প্রকাশ, ধর্মবিশ্বাস ও পূজার্চনায় প্রত্যেকের স্বাধীনতা আছে।

ধর্ম, জাতি, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ বা জন্মস্থানের কারণ বশতঃ কারও প্রতি কোন বৈষম্যমূলক আচরণ করা হবে না।

চাকরীর ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের সমান অধিকার থাকবে।

অস্পৃশ্যতা বিলোপ করা হলো।

কোন ভারতীয় কোন বিদেশী রাষ্ট্রের উপাধি গ্রহণ করতে পারবে না।

সমিতি গঠন, স্বাধীনভাবে চলাফেরা, মনোমত বৃত্তি গ্রহণ এবং সম্পত্তি কেনা-বেচার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে।

প্রচলিত আইন লঙ্ঘন না করলে কেউ অভিযুক্ত হবে না। একই অপরাধের জন্য কাউকে একাধিকবার অভিযুক্ত করা বা দণ্ড দেওয়া চলবে না। যথাবিহিত দণ্ডের চেয়ে বেশী শাস্তি দেওয়া চলবে না।

আটকের কারণ না জানিয়ে কাউকে আটক রাখা যাবে না। ধৃত ব্যক্তির মনোমত আইনজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে আত্মসমর্থনের অধিকার থাকবে। ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ছাড়া কাউকে আটক রাখা চলবে না।

বাধ্যতামূলক শ্রম নিষিদ্ধ করা হলো।

চৌদ্দ বছরের কমবয়সী কোন ছেলেমেয়েকে কারখানা, খনি বা কোন বিপজ্জনক কাজে নিয়োগ করা চলবে না।

হিন্দু বলতে শিখ, জৈন ও বৌদ্ধদেরও বুঝাবে। সব হিন্দুদের সাধারণ ধর্মমন্দিরগুলি সর্বশ্রেণীর হিন্দুর জন্য উন্মুক্ত করার অধিকার রাষ্ট্রের থাকবে।

রাষ্ট্রের অর্থে পরিচালিত কোন শিক্ষালয়ে ধর্ম সম্পর্কে কোন উপদেশ দেওয়া চলবে না। এবং কাউকে ধর্মাচরণে বাধ্য করা হবে না।

নাগরিকদের নিজস্ব ভাষা, লিপি বা সংস্কৃতি রক্ষার অধিকার থাকবে। রাষ্ট্রের সাহায্য প্রাপ্ত শিক্ষালয়ে বিদ্যালাভের অধিকার প্রত্যেকের থাকবে।

রাষ্ট্র এমন সমাজ-ব্যবস্থা সৃষ্টি করে জনসাধারণের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করবে যাতে সামাজিক আর্থিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার জাতীয় জীবনের সকল প্রতিষ্ঠানকে অনুপ্রাণিত করে।

রাষ্ট্র এমনভাবে তার নীতি পরিচালনা করবে যেন নাগরিকগণ অভাবের তাড়নায় তাদের বয়স ও শক্তির প্রতিকূল কোন কাজ করতে বাধ্য না হয়। এবং কৈশোর ও যৌবনকে শোষণ এবং নৈতিক ও বাস্তব অধঃপতন থেকে রক্ষা করতে হবে।

রাষ্ট্র চৌদ্দ বছর বয়স অবধি সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক শিক্ষাদানের চেষ্টা করবে। রাষ্ট্র ক্ষতিকর মাদক পানীয় নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করবে।

নাগরিকদের পুষ্টি, জীবনযাত্রার মান-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিবিধান রাষ্ট্র প্রাথমিক কর্তব্য বলে মনে করবে।

ভারতবর্ষের একজন রাষ্ট্রপতি থাকবেন। পাঁচ বছরের জন্য তিনি নির্বাচিত হবেন। ইচ্ছা করলে তিনি পদত্যাগ করতে পারেন তিনি অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হবেন। এবং তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশ বছরের কম হবে না। যিনি কোন লাভজনক সরকারী পদে অধিষ্ঠিত আছেন, তিনি রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন। তিনি কোন লাভজনক পদ গ্রহণ করতে পারবেন না।

একজন উপরাষ্ট্রপতি থাকবেন। তিনিও নির্বাচিত হবেন পাঁচ বছরের জন্য।

রাষ্ট্রপতি মন্ত্রী পরিষদ গঠন করবেন। মন্ত্রীগণকে সংসদের সদস্য হতে হবে।

লোকসভা ও রাজ্যসভা নিয়ে ভারতীয় সংসদ গঠিত হবে। লোকসভার সদস্য-সংখ্যা পাঁচশো আর রাজ্যসভার সদস্য-সংখ্যা আড়াই শো। এরা সকলেই নির্বাচিত হয়ে আসবেন। শুধু রাজ্যসভার বারোজন সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হবেন। লোকসভার সদস্যের বয়স পঁচিশের কম হবে না, আর রাজ্যসভার সদস্যের বয়স পঁয়ত্রিশের কম হবে না। এক এক বারের নির্বাচিত লোকসভা পাঁচবছর অবধি চালু থাকবে। লোকসভা পরিচালনা করবেন অধ্যক্ষ—স্পীকার। কোন সদস্য বিনা অনুমতিতে ৬০ দিন অনুপস্থিত থাকলে তাঁর পদ শূন্য বলে ঘোষণা করা হবে। সংসদের মধ্যে কোন কথা বলার জন্য কোন সদস্যকে আদালতে অভিযুক্ত করা হবে না।

সংসদের কাজ পরিচালিত হবে হিন্দি বা ইংরেজিতে।

ষোলটি অঙ্গরাজ্য নিয়ে জাতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। প্রত্যেক রাজ্যে একজন রাজ্যপাল থাকবেন, তাঁকে পাঁচ বছরের জন্য নিয়োগ করবেন রাষ্ট্রপতি। রাজ্যপালের বয়স ৩৫ বছরের কম হবে না। তিনি রাজ্যের বিধান-মণ্ডলী থেকে মন্ত্রী-পরিষদ গঠন করবেন। কোন কোন রাজ্যে বিধান-মণ্ডলী একটি সভামাত্র—বিধানসভা। আবার কোন কোন রাজ্যে দুটি সভা—বিধান-সভা ও বিধান-পরিষদ। এখানকার সদস্যরাও পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন। বিধান সভার কার্য পরিচালনা করবেন একজন অধ্যক্ষ।

একুশ বছর বয়স হলেই সুস্থমস্তিষ্ক চরিত্রবান নাগরিক নির্বাচনে ভোট দেবার অধিকার পাবেন।

যে কোন রাজ্য তার আঞ্চলিক ভাষাকে সরকারী কাজে ব্যবহার করতে পারবে। ১৪টি ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে: বাংলা, অসমীয়া, হিন্দি, গুজরাটি, মারাঠী, তামিল, তেলেগু, উর্দু, কানাড়া কাশ্মীরী, মালয়ালম, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী ও সংস্কৃত।

রাষ্ট্রপতির বেতন মাসিক দশহাজার টাকা।

রাজ্যপালের বেতন মাসিক সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা।

সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেতন মাসিক পাঁচ হাজার এবং অন্যান্য বিচারপতির মাসিক চার হাজার টাকা।

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বেতন মাসিক চার হাজার এবং অন্যান্য বিচারপতির মাসিক সাড়ে তিন হাজার টাকা।

জাতীয় সংবিধানের সংহিতা বিরাট গ্রন্থ, বহু নীতির বহু বিস্তারিত ব্যাখ্যায় পূর্ণ। এখানে শুধু মূল নীতির কথাই সংক্ষেপে বলা হলো।

কাজের কথা

"হে ভারত ভুলিও না, নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ; ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ! আর বল দিনরাত—মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

রাজ্য পাইতে চাও তো সহস্র লোকের দুঃখকে আপনার দুঃখ বলিয়া গ্রহণ করো। সহস্র লোকের বিপদকে আপনার বিপদ বলিয়া বরণ করো, সহস্র লোকের দারিদ্র্যকে আপনার দারিদ্র্য বলিয়া স্কন্ধে বহন করো—এ যে করে সেই রাজা, সে পর্ণকুটিরেই থাক আর প্রাসাদেই থাক্। যে ব্যক্তি সকল লোককে আপনার বলিয়া মনে করিতে পারে, সকল লোক তো তাহারই। পৃথিবীর দুঃখ হরণ যে করে সেই পৃথিবীর রাজা। পৃথিবীর রক্ত ও অর্থ শোষণ যে করে সে তো দস্যু—সহস্র অভাগার অশ্রুজল তাহার মস্তকে অহর্নিশ বর্ষিত হইতেছে, সেই অভিশাপ ধারা হইতে কোনো রাজচ্ছত্র তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না।...

আমি বলিতেছি, আমার দেশে যে দুর্গতি ঘটিয়াছে তাহার কারণ আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে, এবং তাহার প্রতিকার আমাদের নিজের ছাড়া আর কাহারও দ্বারা কোনদিন সাধ্য হইতে পারে না। আমরা পরের পাপের ফলভোগ করিতেছি ইহা কখনই সত্য নহে, এবং নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সুকৌশলে পরকে দিয়া করাইয়া লইব ইহাও কোনো মতে আশা করিতে পারি না।...

দেশের অন্ন, দেশের বিদ্যা, দেশের স্বাস্থ্য আমরা তেমন করিয়া চাই নাই। পরের কাছে চাহিয়াছি নিজের কাছে নহে। ওজর করিয়া বলি আমাদের সাধ্য কম, কিন্তু আমাদের সাধনা তার চেয়েও কম।

—রবীন্দ্রনাথ

যখনই তোমরা কোন সন্দেহে পড়বে, অথবা যখন নিজের কথাটাই বড় বলে মনে হবে, তখনই নিম্নলিখিত পরীক্ষা প্রয়োগ করবে। সবচেয়ে গরীব ও সবচেয়ে দুর্বল যে মানুষটিকে তুমি দেখেছ তার মুখখাদি স্মরণ করে নিজেকে জিজ্ঞাসা করবে যে যে-কাজ তুমি করতে মনস্থ করেছ তা সেই লোকটির কোন উপকারে লাগবে কি না। তার দ্বারা তার কিছু লাভ হবে কি ? তার জীবন ও ভবিষ্যৎকে আয়ত্ত করার মত সামর্থ ফিরে পাবে কি ? অর্থাৎ, বুভূক্ষিত, আধ্যাত্ম ক্ষুধায় ক্ষুধিত লক্ষ লক্ষ জনগণের স্বরাজ আসবে কি সেই পথে ?

তখনই তুমি দেখবে তোমার সন্দেহ ও স্বার্থ দ্রবীভূত হয়ে যাচ্ছে।...

বহু বৎসরের পরাধীনতার সঞ্চিত জঞ্জাল আমাদের সাফ করতে হবে। হয়তো সারা জীবন ধরে খাটলেও তা শেষ হবে না।...বজ্র কঠোর সংকল্পে হৃদয় বেঁধে, উচ্চ-উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে আমাদের হতাশার অন্ধকার অতিক্রম করতে হবে।...বিশ্বাস ও সাহস অবলম্বন করে থাকলে ভারতে নূতন যুগের অভ্যুদয় হবে।

—মহাত্মা গান্ধী

"......পল্লীসমাজ বাঙ্গালীর সভ্যতা সাধনার কেন্দ্রস্থল। সেই কেন্দ্রস্থল যদি ব্যাধিদুষ্ট হইয়া তাহার সঞ্জীবনীশক্তি হারাইয়া ফেলে, তাহার ফলে সমস্ত জাতিটিই অক্ষম ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে।......শরীর দুর্বল হইলেই ব্যাধিমন্দির হইয়া পড়ে, আমাদের এক হাতে এই দেশের স্বাস্থ্যকে রক্ষা করিতে হইবে, আর এক হাতে তাহারই কাছে যে দারিদ্র্য উহার সহিত আছে, তাহা ঘুচাইতে হইবে। স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে

হইলে চাষাদিগকে সেই সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিতে হইবে, গ্রামে গ্রামে জলকষ্ট নিবারণ করিতে হইবে, নূতন পুষ্করিণী খনন করিতে হইবে, পুরাতন পুষ্করিণীর সংস্কার করিতে হইবে, বনজঙ্গল পরিষ্কার করিতে হইবে এবং চাষারা যাহাতে আরও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে জীবনধারণ করিতে পারে, তাহার উপায় করিয়া দিতে হইবে। অর্থাগমের ব্যবস্থা করিতে হইলে চাষাকে দেশের রাক্ষস মহাজনদের হাত হইতে রক্ষা করিয়া কম সুদে তাহার আবশ্যকীয় টাকা ধার দিবার জন্য গ্রামে গ্রামে তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া ছোটখাট ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।······

······জনসংখ্যা ও কার্যের সুবিধা অনুসারে কতকগুলি গ্রাম লইয়া এক একটি পল্লী বা গ্রাম্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।····· বর্ণধর্ম নির্বিশেষে সকলেই এই সমাজভুক্ত হইবে। তাহারা সকলে মিলিয়া পাঁচজন পঞ্চায়েৎ নির্বাচন করিবে।······তাহারা গ্রামের পথ-ঘাটের ব্যবস্থা করিবেন। গ্রামের স্বাস্থ্য কি করিয়া রক্ষা করা যায়, তাহার উপায় নির্ধারণ করিয়া তাহাকে কার্যে পরিণত করিবেন।······যে সকল যাত্রাগান ছিল, সেই সব আবার চালাইতে চেষ্টা করিবেন। নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিক্ষার বিস্তার করিবেন। চাষাকে কৃষিকার্য সম্বন্ধে যে সকল শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক, তাহা ব্যবস্থা করিবেন।······ নূতন পুষ্করিণী খনন করিবেন ও পুরাতন পুষ্করিণী সংস্কার করাইবেন।······ চাষারা যাহাতে বারমাস পরিশ্রম করিয়া নিজেদের আবশ্যকীয় দ্রব্যসকল প্রস্তুত করিতে পারে ও অন্যান্য শিল্পপণ্যও প্রস্তুত করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়া এই সব কার্যের উপায় করিয়া দিবেন। এই পল্লীসমাজ প্রতিপল্লীতে একটি সাধারণ ধান্যাগার স্থাপন করিবেন। প্রত্যেক গৃহস্থ চাষা সেই ধান্যাগারে তাহাদের ক্ষেতের ফসল হইতে কিছু কিছু করিয়া ধান্য দিবেন।···অজন্মা, দুর্ভিক্ষ ও বীজের জন্য ধান্যের অভাব হইলে পল্লীসমাজ তখন চাষাদের প্রয়োজন মত হিসাব করিয়া ধার দিবেন। ······কোন কলহ অথবা ছোট ছোট দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে, উক্ত পঞ্চায়েৎই তাহার নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন।······

প্রত্যেক জেলার জনসংখ্যা অনুসারে ২০টি ২৫টি পল্লীসমাজ থাকিবে।......

জেলার মধ্যে কোন্ কোন্ দ্রব্যের ব্যবসা বাণিজ্য চলিতে পারে তাহা নির্ধারণ করিয়া ও উপযুক্ত লোক নির্বাচন করিয়া ছোটখাট ব্যবসা চালাইতে হইবে।......

জেলা ও পল্লীসমাজের কোন কার্যেই গবর্মেন্টের কোন কর্মচারী সংশ্লিষ্ট থাকিবে না।

সেই সঙ্গে ইহাও বিচার করিতে হইবে, আমাদের দেশে যত চাষ-অযোগ্য জমি আছে, সব ভাল করিয়া চাষ করিলেও আমাদের অবস্থা স্বচ্ছল হয় কি না। যদি না হয় তবে ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা আলোচনা ও বিচার করিতে হইবে।......

আমাদের বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসের ব্যবসা-বাণিজ্যেরও একটি রীত আছে।......কুটিরশিল্পজাত যে পণ্য তাহা এক রকম উঠিয়া গিয়াছে; পূর্বে আমাদের বাংলা দেশে......কাপড় প্রস্তুত হইত।......কাঁসা পিতলের বাসন তৈরী হইত।......আমাদের দেশে কাগজ তৈরী হইত, সোনারূপার অনেক প্রকার অলঙ্কার আমরা তৈরী করিতাম। ঝিনুকের শিল্প, ডাকের সাজ ও অনেক প্রকার শিল্পের কাজ যাহা এক সময় আমাদের দেশের গর্ব ছিল আজ তাহার পুনরুদ্ধার করিতে হইবে।......

......প্রথমেই আমাদের বিলাস বিসর্জন করিতে হইবে। বিলাস বর্জনের ফলে আমরা অনেক অনাবশ্যকীয় পণ্যদ্রব্যের হাত হইতে রক্ষা পাইব।

—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

পূর্ণ সাম্যবাদের উপর নূতন সমাজকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। জাতিভেদের সকল আয়তনকে একেবারে ধূলিসাৎ করিতে হইবে। নারীকে সর্বভাবে মুক্ত করিয়া সমাজে ও রাষ্ট্রে পুরুষের সহিত সমান অধিকার ও দায়িত্ব প্রদান করিতে হইবে, অর্থের বৈষম্য দূর করিতে হইবে এবং বর্ণবৈষম্য নির্বিশেষে প্রত্যেকে (কি পুরুষ কি নারী) যাহাতে শিক্ষার ও উন্নতির সমান সুযোগ ও সুবিধা পায় তার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমাজতন্ত্রমূলক সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র যাহাতে স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে।···

নরনারী নির্বিশেষে প্রত্যেক মানবেরই একটা জন্মগত সাম্য আছে এবং তাহাকে বিকশিত করিবার সকল সুযোগই আমাদের দিতে হইবে।···

League of young intellectuals গঠন করা আবশ্যক। কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, বাণক, বৈজ্ঞানিক এবং সকল ক্ষেত্রের কর্মী এই league-এর সভ্য হইবেন। এক কথায় বলিতে গেলে, যাহা best brain of the entire nation, তাঁহাদের একত্র করিতে হইবে—তাহাদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের সুযোগ করিয়া দিতে হইবে এবং তাঁহারা সকলে যাহাতে একই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৃষ্টি-কার্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়া সমগ্র জাতিকে সবল সুস্থ কৃতী করিয়া তোলেন তাহার আয়োজন করিতে হইবে।···

—সুভাষচন্দ্র

আমরা এক মহান দেশের মানুষ, যে দেশ শুধু ভৌগোলিক সংজ্ঞাতেই বিরাট নয় আরও নানা দিক থেকে বিরাট। এই দেশের যোগ্য হতে হলে আমাদের বড় মন ও বড় হৃদয় থাকা চাই; কারণ অন্তরে যে ছোট সে বড় কাজ করতে পারে না। প্রত্যেকেই তার দেশের প্রতি তার জাতির প্রতি নিজ কর্তব্য করুক।···এই দেশের বিরাট জনসমাজ যদি নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী বিভিন্ন দিকের কাজ করতে থাকে, এবং

নিজেদের তুচ্ছ বিভেদ ভুলে গিয়ে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে তাহলে আশ্চর্যজনক দ্রুতগতিকে ভারতের উন্নতি হবে।… -

জাতির কর্ম কখনও শেষ হয় না। মানুষ আসে যায়, যুগ শেষ হয় কিন্তু জাতির জীবন চলতে থাকে।…

কেবল কঠিন পরিশ্রমই আমাদের সমৃদ্ধ করতে পারে, এবং আমাদের দারিদ্র মোচন করতে পারে। আমরা প্রত্যেকে পুরুষ ও নারী, যুবক বৃদ্ধ অবশ্যই পরিশ্রম করবো। বিশ্রাম আমাদের জন্য নয়। আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি বিশ্রাম করার জন্য নয়, স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য আরো বেশী পরিশ্রম করার জন্য, স্বাধীনতাকে শক্তিমান করার জন্য। ক্রীতদাসের বৈচিত্র্যহীন পরিশ্রম এ নয়, এ স্বাধীন মানুষের উদ্দেশ্যমূলক স্বেচ্ছাশ্রম। আমাদের পরিশ্রম মহৎ ভবিষ্যতের ভিত্তি স্থাপনা করবে এবং ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীকে ভালবেসে আমরা যে পরিশ্রম করবো তা দীর্ঘস্থায়ী হবে। আমরা ইঁটের পর ইঁট সাজাব, স্বাধীন ভারতের ইমারত গড়বো। এ কাজে আনন্দ আছে, এবং আমরা চলে যাবার পরেও আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা এর ফল ভোগ করবে।

আমাদের দেশ বিরাট দেশ এবং এখানে আমাদের অনেক কাজ করার আছে। আমরা যদি নিজেদের সামান্য সামান্য কর্তব্যটুকু করি তাহলেই সেই সব একত্র হয়ে আমাদের দেশের সমৃদ্ধি স্তূপীকৃত ও দ্রুতগামী হবে।

—জওহরলাল

আমাদের স্মরণীয় দিন

১৭৬০—সন্ন্যাসী বিদ্রোহ

১৮৫৭—সিপাহী বিদ্রোহ

১৮৮৫—কংগ্রেসের জন্ম

১৮৯৩—শিকাগো ধর্মসভায় স্বামিজীর বক্তৃতা

১৯০২—প্যারিসের বিজ্ঞান সম্মেলনে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বক্তৃতা

১৯০৫—বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও বিদেশী বর্জন আরম্ভ

১৯০৬—দাদাভাই নৌরজী 'স্বরাজ' কথাটি প্রথম দেশবাসীকে শোনালেন

১৯০৮—দেশের জন্য আত্মহত্যা করলেন প্রফুল্ল চাকী, ফাঁসি গেলেন ক্ষুদিরাম বসু

১৯১১—দিল্লীর দরবারে বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত হোল

১৯১৩—রবীন্দ্রনাথের নোবেল-পুরস্কার লাভ

১৯১৫—কোপদিপোতায় বাঘা-যতীনের লড়াই

১৯১৯—জালিয়ানওয়ালা-বাগের হত্যাকাণ্ড, রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সরকারী 'স্যার' খেতাব বর্জন ও গান্ধীজী কর্তৃক 'কাইজার-ই-হিন্দ' পদক প্রত্যার্পণ

১৯২০—অসহযোগ আন্দোলনের আরম্ভ

১৯২১—বছরে চার আনা দিয়ে কংগ্রেসের সদস্য হবার নিয়ম প্রবর্তন

১৯২৩—'স্বরাজ্যদল' আইন সভায় যোগ দিল

১৯২৯—পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী

১৯৩০—আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ,…চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন…পদার্থ-বিজ্ঞানে রামণের নোবেল পুরস্কার লাভ

১৯৩১—কংগ্রেসীদের গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান

১৯৩৭—ভারতের সাতটি প্রদেশে কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ

১৯৩৯—কংগ্রেসী মন্ত্রীদের পদত্যাগ

১৯৪২—ভারত ছাড়ো আন্দোলন

১৯৪৩—মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্রের যুদ্ধ ঘোষণা ও স্বাধীন ভারত সরকার গঠন…

১৯৪৪—ইম্ফলে আজাদ হিন্দ ফৌজ কর্তৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলন

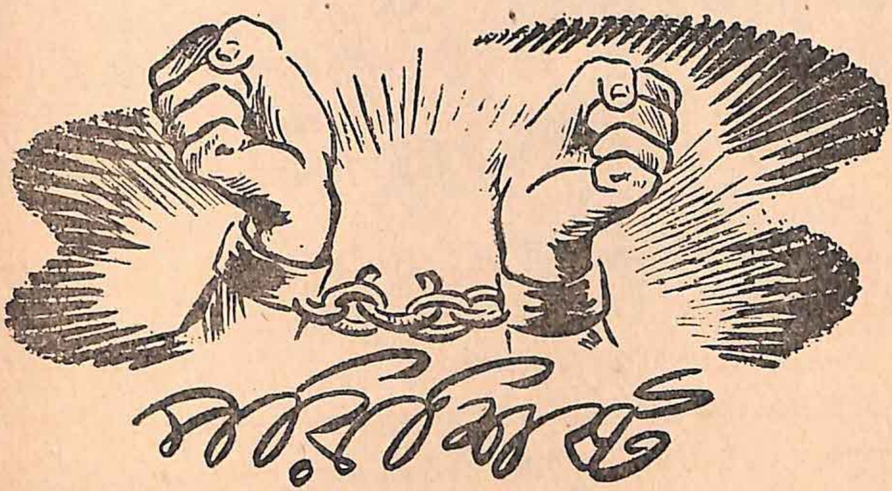
১৯৪৫—মন্ত্রী-মিশনের ভারতে আগমন ও অন্তর্বর্তী সরকার গঠন… ভারতীয় নৌসেনার বিদ্রোহ

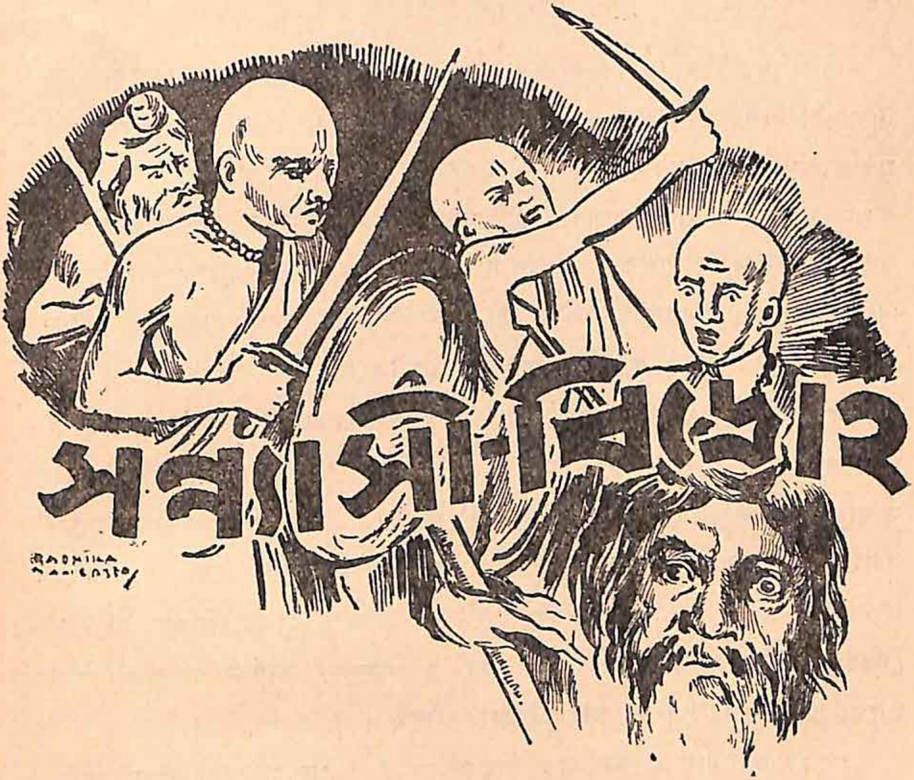
১৯৪৬—পাকিস্তান করার জন্য বাংলা ও পাঞ্জাবে নাদির-শাহী হত্যাকাণ্ড

১৯৪৭—হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানে ভারত বিভাগ, বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্ত, পার্লামেণ্ট কর্তৃক ভারতকে স্বাধীনতা দানের আইন পাস…সরোজিনী নাইডুর সভাপতিত্বে এশিয়া মহাসম্মেলন

১৯৪৮—মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা—বিশ্বের শোক

মহাত্মা গান্ধী ১৯১৮ সাল থেকে ১৯৪৮ অবধি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। তিনি না থাকলে ভারতভূমি স্বাধীনতা লাভ করিতে পারতো না। কিন্তু এই স্বাধীনতার মাঝে অভিশাপের মত নেমে এলো জিন্নার পাকিস্তান। মুসলীম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নামে বাংলা, পাঞ্জাব, কাশ্মার, সিন্ধু, বেলুচিস্থান ও পেশোয়ারে হিন্দুদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার চেষ্টা হোল। গান্ধীজী তার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন, সর্ব ধর্ম সমন্বয় করার জন্য প্রার্থনা সভায় তিনি উপনিষদ ও কোরাণ পাঠ সুরু করলেন। অনেকে গান্ধীজীকে ভুল বুঝলো। শেষে ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী বিকাল ৬টা ৫ মিনিটের সময় যখন তিনি দিল্লীর বিরলা-ভবন থেকে প্রার্থনা সভায় যাচ্ছেন, সেই সময় এক হিন্দু তাঁকে পর পর তিনটি গুলি করে। 'হা রাম' বলে গান্ধীজী অচেতন হয়ে পড়ে যান। তাঁকে বিরলা-ভবনে নিয়ে আসা হয়। ৬টা ৪০ মিনিটে তিনি দেহত্যাগ করেন। সারা জগৎ শোকার্ত হয়ে পড়ে। যিশু ও সক্রেটিসের মৃত্যুর পর পৃথিবীর ইতিহাসে এ ধরনের অনাচার আর ঘটেনি, আব্রাহাম লিংকন ও জোয়ান-দার্কের মৃত্যু-দৃশ্য মনে জাগে। ভারতের পুণ্যভূমিতে এতো বড় পাপ কোন হিন্দুর দ্বারা কোনদিন সংঘটিত হয়নি। এই একটি হত্যাকাণ্ডে ভারতের ইতিহাস চিরদিনের মত কলঙ্কিত হোল, কোটি কোটি মানুষের চোখের জলে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে কি না একমাত্র বিধাতাই জানেন!





সতেরো শো সাতান্ন সালে পলাশীর যুদ্ধের পর ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজা হয়ে বসলো। বছর সাতেক পরে মীরকাসিম একবার চেষ্টা করলেন তাদের কবল থেকে মুক্তি পেতে, বক্সারের যুদ্ধে সে আশা নষ্ট হোল। সাহেবরা এবার সুরু করলো নতুন আইন-কানুন করে এদেশের সম্পদ লুঠ করতে। জমিদারী কেড়ে নিয়ে নীলামে চড়ালো, জুলুমের জ্বালায় চাষীরা হোল সর্বস্বান্ত, অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠলো দেশের সর্বত্র।

বিদেশীর এই অনাচার থেকে দেশবাসীকে মুক্তি দেবার জন্য একদল সন্ন্যাসী ও ফকির সঙ্ঘবদ্ধ হোল। এই সন্ন্যাসীদলের নায়ক ছিলেন ভবানী পাঠক, আর এই ফকিরদলের নায়ক ছিলেন মাখনপুর-নিবাসী মজ্‌নু শাহ। এঁদের সঙ্গে ছিলেন—দেবী চৌধুরাণী,মাদার বক্‌স্, মুছা শা, চেরাগ আবলি শা প্রভৃতি।

এক একটি পুণ্য তিথিতে স্নান-যাত্রা কি কোন মেলা উপলক্ষে এক এক তীর্থে এই সন্ন্যাসীর দল এসে সমবেত হতেন। কখন বগুড়া জেলার মহাস্থানে, কখন ঢাকা জেলার লাঙ্গলবন্ধে, কখন-বা গঙ্গাসাগর মেলায়, কখন-বা পুরীর রথযাত্রায়। ফকিরেরা একত্র হতেন কখন পাণ্ডুয়ার দরগায়, কখন মালদহের আদিনা দরগায়, কখন-বা গারো পাহাড়ের শাহ-কামালের দরগায়। এঁরা থাকতেন ভিখারীর মত, বেশভূষার কোন বালাই ছিল না—কারুর গেরুয়া কি একটুকরো সাদা কাপড়, কেউবা একেবারে কৌপীনধারী, বাড়ী-ঘর আত্মীয়-পরিজন বলে কেউ ছিল না। দান ও দক্ষিণা বলে লোকে যা দিত তাই তাঁরা গ্রহণ করতেন, জনসাধারণের কাছে এঁদের সম্মান ছিল খুবই। সেইজন্যই ইংরেজ-শাসনে জনগণের দুঃখ যখন চরমে গিয়ে উঠলো তখন এঁরা আর চুপ করে থাকতে পারলেন না, ধর্ম-চর্চা ছেড়ে কিছুদিনের জন্য অস্ত্রচর্চায় মন দিলেন। এই মেলাগুলিই হোল তখন তাঁদের পরামর্শের কেন্দ্র,—কোথায় অস্ত্র পাওয়া যাবে, আর কি ভাবে ইংরেজকে ঠেঙ্গাতে হবে।

অনেক জায়গায় এঁদের সঙ্গে হাজার হাজার নিঃস্ব সর্বহারা এসে যোগ দেয়। তথাপি ব্যাপকভাবে একসঙ্গে কিছু করার মত বড় কোন পরিকল্পনা এঁরা করতে পারেন নি। সেইজন্যই চল্লিশ বছর ধরে এঁরা শুধু ইংরেজকে বিব্রত করে রেখেছিলেন, দেশ থেকে বিতাড়ন করতে পারেননি, যখন যেখানে অত্যাচার সীমা ছাড়িয়েছে তখন সেখানেই এঁরা আঘাত করেছেন।

১৭৬০ সালে এই সন্ন্যাসীদের ভয়ে ওয়াট্ ও হোউইট্ সাহেবকে বর্ধমান ও কৃষ্ণনগর ছেড়ে কলিকাতায় পালিয়ে আসতে হয়।

১৯৬৩ সালে ফকিরেরা বাখরগঞ্জ আক্রমণ করে এবং ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির ঢাকার ফ্যাক্টরি দখল করে। ফেলি ও লিসেস্টার সাহেব পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচান।

১৭৬৫ সালে রামপুর-বোয়ালিয়ার ফ্যাক্টরি দখল করে সেখানকার বেটন সাহেব আর তার দলবলকে ধরে নিয়ে সন্ন্যাসীরা পাটনায় তাদেরকে হত্যা করে।

১৭৬৬ সালে কুচবিহারের রাজা রুদ্রনারায়ণের পক্ষে সন্ন্যাসীরা লড়াই করে, ইংরেজ সেনাপতি মরিসন পালিয়ে বাঁচে।

১৭৬৯ সালে জলপাইগুড়িতে এক লড়াইয়ে মার্টল সাহেব নিহত হয়।

১৭৭০ সালে সন্ন্যাসীদেরকে ধরতে গিয়ে রংপুরে সদলবলে কিথ্ সাহেব খুন হয়।

১৭৭১ সালে ঘোড়াঘাটে ফেলথাম সাহেবের সঙ্গে ফকিরদের লড়াই হয়।

১৭৭২ সালে রংপুরে এক লড়াইয়ে ক্যাপ্টেন টমাস সসৈন্যে হত হয়।

১৭৭৩ সালে কুমারখালির কাছে এক যুদ্ধে সন্ন্যাসীদের হাতে মেজর ডগলাস ও ক্যাপ্টেন এডোয়ার্ড নিহত হয়।

এই ভাবেই চলে চল্লিশ বছর ১৭৬০ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত—উত্তর বিহার ও নেপাল সীমান্ত থেকে জলপাইগুড়ি, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া পাবনা, ময়মনসিং, ঢাকা, বাখরগঞ্জ, যশোহর ও উড়িষ্যার কোন কোন জায়গায়। অনেক স্থানে জঙ্গলের মাঝে অথবা পাহাড়ের মাথায় এঁদের দুর্গও ছিল। জলপাইগুড়িতে সন্ন্যাসীকোট দুর্গ এখনও আছে। বগুড়ার মহাস্থানগড়ের দুর্গ খুব প্রসিদ্ধ ছিল। ভাওয়ালের জঙ্গলে এখনও তাদের দুর্গ ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। ঘোড়ায় চড়তে এবং বন্দুক তলোয়ার তীরধনু বর্শা ও লাঠি চালাতে এঁরা ছিলেন সিদ্ধহস্ত। অনেক সময় লাঠি চালিয়ে এঁরা সরকারী ফৌজের বন্দুক কেড়ে নিতেন। এঁদের সাহস ছিল অদম্য, বুদ্ধি ছিল ধারালো, কিন্তু খণ্ড খণ্ড ভাবে এঁরা অভিযান চালাতেন বলে অনেক সময় এঁদেরকে শুধু গেরিলা যুদ্ধ করতে হোত।

চল্লিশ বছর ধরে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ চলেছিল। ইস্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানির সঙ্ঘবদ্ধ গবর্মেণ্টকে তাঁরা উৎখাত করতে পারেননি বটে, কিন্তু অনেক অত্যাচারের প্রতিরোধ করেছিলেন। শুধু যে সন্ন্যাসীই ছিল তা নয়, অনেক সন্ন্যাসিনীও ছিলেন যাঁরা রীতিমত গেরিলা যুদ্ধ চালাতেন। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা এঁদেরকে বলেছে—ডাকাত, যাযাবরের দল।

কিন্তু অষ্টাদশ শতক ও ঊনবিংশ শতকে সিপাহী-বিদ্রোহ ছাড়া এত বড় ও এমন ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান এদেশে আর ঘটেনি।



সিপাহী-বিদ্রোহ

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর ইস্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানি ভারতে রাজ্য বিস্তারের দিকে মন দিল। সারা দেশ তখন নানা ছোট-বড় রাজ্যে ভাগ হয়ে গেছে, সবাই নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত, দিল্লীর বাদ্‌শাকে কেউ আর মানতেই চায় না। ইংরেজরা এমন সুযোগ ছাড়তে পারলো না। কাউকে ভয় দেখিয়ে সন্ধির নাম তাঁবেদারী-কাগজে সই করিয়ে নেয়, কারুর পোষ্যপুত্রকে তাড়িয়ে দিয়ে রাজ্য দখল করে বসে, কাউকে আবার প্রজাদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে বলে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দেয়। ভারতের সম্পদ ও অর্থ শোষণ করাই ছিল ইংরেজদের লক্ষ্য। মনে হ'লে বেগমদের মহলে ঢুকে গহনা লুঠ করতেও তাদের বাধেনি। এজন্য রাজা ও নবাবদের মনে অসন্তোষ জমে উঠছিল, তা ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়লো ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে। দেশী সিপাহীরা ইংরেজদের কাছে সুব্যবহার পেতো না, গোরা সৈনিকেরা চল্লিশ টাকা মাহিনা পেত আর দেশী সিপাহীরা মাহিনা পেত ছ'টাকা। কোন রকম বিরক্তি প্রকাশ পেলে, সুবিচার পাবার কথা দূরে থাক, তাদের চাকরী চলে যেত, বিদ্রোহী বলে

কাউকে দেওয়া হোত ফাঁসী, কাউকে বা কামানে বেঁধে তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হোত।

রাজ্যহীন রাজারা আর সিপাহীরা এক হোল, স্থির হোল বিদেশীকে এদেশ থেকে তাড়াতে হবে। ২৩শে জুন মধ্যভারত, বাংলা, বিহার ও যুক্তপ্রদেশের সমস্ত সিপাহী ইংরেজের বিরুদ্ধে এক সঙ্গে বিদ্রোহ করবে।

কিন্তু তার আগেই ঘটলো বিপর্যয়। ২৯শে মার্চ বাংলাদেশের ব্যারাকপুর সেনা-নিবাসে মঙ্গল পাঁড়ে নামে এক ব্রাহ্মণ-সৈনিকের গুলিতে একজন পদস্থ ইংরেজ সৈনিক নিহত হোল···১০ই মে মীরাটের সৈন্যরা বৃটিশ সেনার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরলো···নেতাদের ২৩শে জুনের কার্যক্রম গোলমাল হয়ে গেল। ইংরেজরাও সাবধান হবার সুযোগ পেল।

কিন্তু তবুও বিদ্রোহের আগুন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে দেরী হোল না। দিল্লীর বাদশা বাহাদুর শা'কে বিদ্রোহীরা ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করলো। বিদ্রোহীদের প্রধান প্রধান ঘাঁটী হোল দিল্লী, লখ্‌নৌ, কানপুর, বেরিলী ও ঝাঁসী। কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধে ইংরেজরা হেরে গেল। এতদিন তারা ছল ও কৌশল দিয়েই কাজ উদ্ধার করছিল, কিন্তু এমন ধারা বিপদের সামনে যে কোনোদিন তাদেরকে পড়তে হবে তা ভাবেনি, তারা কি করবে ভেবে পেল না। শেষে তারা বিলাতে খবর পাঠালো। সেখান থেকে স্যার কলিন্ ক্যাম্‌বেল বহু গোরা সৈন্য নিয়ে এদেশে এলেন বিদ্রোহ দমন করতে।

কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধ ঘটে গেল। প্রথমেই লক্ষ্ণৌয়ের কথা। সিপাহীরা আক্রমণ করতেই লক্ষ্ণৌয়ের চীফ-কমিশনার স্যার হেনরী লরেন্স সেখানকার সমস্ত সাহেব-মেমদেরকে নিয়ে বৃটিশ রেসিডেন্সিতে আশ্রয় লন। সিপাহীরা তাদেরকে অবরোধ করে, সেই সংঘর্ষে লরেন্স নিহত হোল। তারপর আউট্‌রাম ও হ্যাব্‌লক্ নামে দু'জন সেনাপতি একদল সেনা নিয়ে এলো, কিন্তু তারাও হেরে গেল। শেষে স্যার কলিন ক্যামবেল আরেকদল সৈন্য নিয়ে এসে সাহেবদের উদ্ধার করেন। লক্ষ্ণৌয়ের বিদ্রোহীরা এঁর হাতে পরাজিত হয়।

তারপর কানপুর। এখানকার বিদ্রোহীদের নেতা ছিলেন নানা-সাহেব আর তাঁর সহকারী ছিলেন তাঁতিয়া টোপী। এখানে অনেক ইংরেজ বাস করতো। সিপাহীদের আক্রমণের সময় তারা একটি দেয়ালের আড়ালে গিয়ে আত্মরক্ষা করছিল। নানা-সাহেব তাদেরকে আশ্বাস দেন যে তারা নির্বিঘ্নে এলাহাবাদ চলে যেতে পারে। কিন্তু চলার পথে সিপাহীরা সাহেবদেরকে গুলি করে মারে, এবং মৃতদেহগুলি একটি কূপের মধ্যে ফেলে দেয়। এই ঘটনার দু'দিন পরে কানপুর ইংরেজরা দখল করে। নানা-সাহেব ও তাঁতিয়া টোপী পালিয়ে যান।

বেরিলিতে সিপাহীরা বিদ্রোহ করে রোহিলা-সর্দারকে নবাব বলে ঘোষণা করে। এক বছর ধরে সেখানে লড়াই চলে শেষে সিপাহীরা হেরে যায়।

ঝাঁসীর বিদ্রোহীদের নায়িকা ছিলেন সেখানকার রাণী—কুড়ি বছরের মেয়ে লক্ষ্মীবাই। তাঁর সঙ্গে তাঁতিয়া টোপী এসে যোগ দেন। কিন্তু এখানেও শেষ অবধি বিদ্রোহীরা জয়লাভ করতে পারেনি। লক্ষ্মীবাঈ পুরুষের বেশে লড়াই করেছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রেই তিনি প্রাণ দিলেন।

ইতিপূর্বেই ইংরেজরা দিল্লী দখল করে ফেলেছিল। কাশ্মীর-ফটক ইংরেজরা কামান দেগে উড়িয়ে দেয়। সেনাপতি হাডসন বাহাদুর-শা'কে বন্দী করে এবং তাঁর দুই ছেলে ও নাতিকে নিষ্ঠুরভাবে গুলি করে হত্যা করে। বাহাদুর-শাহের কোন দোষ ছিল না, তবু তাঁকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয়। তাঁতিয়া টোপী ধরা পড়েন, তাঁর ফাঁসী হয়। নানা সাহেব কোথায় পালিয়ে যান কেউ তা জানে না।

তারপর বিদ্রোহ দমনের নামে সুরু হোল ইংরেজদের অত্যাচার এলাহাবাদ থেকে কানপুর যাবার যে পথ আছে, তার দু'পাশে যত গাছ ছিল তার ডালে দড়ি বাঁধা হোল, যে-সব সিপাহী বন্দী হয়েছিল, তাদের এক-একজনকে এক-একটি ডালে ফাঁসী দেওয়া হোল। অনেক নিরীহ লোককে আবার কামানে বেঁধে তোপ দেগে উড়িয়ে দেওয়া হোল। সিপাহীরা যা করেছিল ইংরেজরা করলো তার শতগুণ।

সিপাহীরা হেরে গেল, কেননা জনসাধারণের সঙ্গে সিপাহীদের কোন যোগ ছিল না। ইংরেজকে এদেশ থেকে তাড়ানো সবাইকারই লক্ষ্য ছিল বটে, কিন্তু কোন দল আরেক দলকে বিশ্বাস করতো না, তাছাড়া এমন কোন নায়ক ছিলেন না যার কথা সবার উপর চলতে পারে, সেইজন্যই একত্রে কোন কার্যক্রম তারা কাজে লাগাতে পারেনি, তাছাড়া নিজাম, গোয়ালিয়র, পাতিয়ালা ও অন্যান্য রাজন্যবর্গ ও গুর্খাসেনারা ইংরেজদেরকে বিশেষভাবে সাহায্য করে, এজন্য অবশ্য পরে ইংরেজরা এঁদেরকে খেতাব ও জায়গীর দিয়ে পুরস্কৃত করে।

সিপাহী-বিদ্রোহ চলে ১৫ মাস,—১৮৫৭ সালের মার্চ থেকে ১৮৫৮ সালের জুন অবধি। নভেম্বর মাসে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানির ব্যবসা শেষ করে দিলেন, এবং এদেশের শাসনভার নিজে গ্রহণ করলেন; হাডসন, নীল প্রভৃতির অত্যাচারে দেশের লোকের মনে নতুন করে যে অসন্তোষ জেগে উঠছিল, তাকে শান্ত করার জন্য মহারাণী ঘোষণা করলেন, যে ইংরেজরা এদেশে আর রাজ্য বাড়াবে না, রাজাদের সঙ্গে যে-সব সন্ধি করা আছে, তাই এবার থেকে মেনে চলা হবে, এদেশের ধর্ম ও সামাজিক আচার-ব্যবহারে ইংরেজরা হস্তক্ষেপ করবে না।



আমেরিকার স্বাধীনতা

আমেরিকায় তিনটি জাতি উপনিবেশ স্থাপন করে,—ক্যানাডাতে ফরাসীরা, দক্ষিণ আমেরিকাতে স্পেনিয়ার্ডস্‌রা আর পূর্ব আমেরিকাতে ইংরেজরা।

ইংরেজদের পর পর তেরোটী উপনিবেশ গড়ে উঠে এখানে ; চা, আলু, তামাক প্রভৃতির আবাদ সুরু হয়। উত্তরের উপনিবেশগুলোতে যারা থাকতো তারা ছোট ছোট ক্ষেতে নিজেরাই আবাদ করতো। কিন্তু দক্ষিণের উপনিবেশগুলিতে যারা থাকতো তাদের ক্ষেত-খামারগুলি ছিল বিশাল, সেই ক্ষেতে চাষ করার জন্য তারা মজুর খুঁজতো। প্রথমে তারা এখানকার পুরানো বাসিন্দা রেড-ইণ্ডিয়ানদের ধরে খাটিয়ে নিতে চেষ্টা করলো, কিন্তু তারা অনেক অত্যাচার সইল, গুলি খেয়ে মরলো, কিন্তু সাহেবদের দাসত্ব করতে চাইল না। তখন আফ্‌রিকা থেকে নিগ্রো ধরে আনা হোল এবং আমেরিকার বাজারে তাদেরকে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রী করা হোল। প্রথমে জন্

হকিন্‌স্ নামে একজন ইংরেজ এই ব্যবসা সুরু করে, রাণী এলিজাবেথ তাকে 'নাইট্' উপাধি দেন।

তবু ব্যবসা জমে না, ভারতবর্ষ থেকে যে চা যায় আমেরিকার চায়ের চেয়ে তার দাম শস্তা, নিজেদের দেশেই তাদের চা বিক্রী হয় না। আমেরিকানরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো, ইস্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানির চা বোঝাই একখানি জাহাজ বোস্টন বন্দরে গিয়ে পৌঁছাতেই আমেরিকানরা সেই জাহাজের উপর চড়াও হোল, সব চা জলে ফেলে দিল (ডিসেম্বর ১৭৭৩)।

ইতিমধ্যে ইউরোপে সাত বছর ধ'রে লড়াই চালিয়ে ইংরেজরা সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। আমেরিকা থেকে তারা কিছু টাকা তোলার চেষ্টা করলো। নানারকম কর ধার্য করলো। তেরোটি স্টেট্-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালো, চীৎকার তুললো—বৃটিশ পার্লামেণ্টের কোন অধিকার নেই আমাদের উপর কর ধার্য করবার, এসব কর আমরা দোব না।

যুদ্ধ বেধে গেল ১৭৭৫ খৃস্টাব্দে। বাংকার্স হিল ও ব্রুকলিনের যুদ্ধে আমেরিকানরা হেরে গেল, ইংরেজরা ফিলাডেল্‌ফিয়া দখল করে ফেললো। কিন্তু আমেরিকানরা মাথা নত করলো না। জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করলো ৪ঠা জুলাই ১৭৭৬ সালে।

এবার বিদেশী সাহায্য এসে পড়লো। ফ্রান্স, স্পেন ও হল্যাণ্ড আমেরিকানদেরকে সাহায্য করলো। রুশিয়া, সুইডেন ও ডেনমার্ক আমেরিকানকে সাহায্য না করলেও ইংরেজদের নানা অসুবিধার সৃষ্টি করতে লাগলো। আটবছর ধরে যুদ্ধ চললো। ইংরেজরা শেষে পরাজয় মানলো। ইয়র্ক-টাউনে আমেরিকানদের কাছে সেনাপতি কর্ণোয়ালিস আত্মসমর্পণ করলেন। ইংরেজরা এবার আমেরিকার সঙ্গে সন্ধি করলো—ভার্সাই সন্ধি (১৭৮৩ খৃস্টাব্দে)। এই সন্ধিতে তেরোটী মার্কিণ রাষ্ট্রকে স্বাধীন বলে ইংরেজরা মেনে নিল। জর্জ ওয়াশিংটন হলেন স্বাধীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি।



ফরাসী বিপ্লব

ফরাসীদেশে রাজা ও জমিদাররা ছিলেন অত্যন্ত বিলাসী, প্রজাদের দুঃখ-কষ্টের পানে তাঁরা তাকাতেন না। একদিকে প্রজারা না খেয়ে মরছে, আরেকদিকে জমিদাররা তখন উৎসব করছে। কেউ এ সম্পর্কে একটী কথা বললেই বিনা বিচারে তাকে জেলে কয়েদ করা হোত, কোন্ আইন ছিল না।

দু'জন বিপ্লবী লেখক এই অনাচারকে আঘাত করেন—ভল্‌তেয়ার ও রুশো। এঁদের বাণী হোল—সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা। এঁরা বললেন—মানুষের এই দুঃখ ও দুর্দশার কারণ হচ্ছে সমাজের বন্ধন ও রাষ্ট্রের বন্ধন। এই বন্ধন যখন ছিল না, তখন ধনী-নির্ধন ছিল না, অবিচার ছিল না।

এদিকে নানা লড়াইয়ের ফলে রাজকোষ শূন্য হয়ে গেল, অর্থ সংগ্রহের জন্য রাজা প্রজাদের মহাসভা—'স্টেট্‌স জেনারেল' আহ্বান করলেন। স্টেট্‌স জেনারেলের সদস্যরা 'জাতীয় মহাসমিতি' নাম নিয়ে রাজ্যের অসঙ্গত আইন-কানুনগুলি বদলে ফেললো। বড়লোকেরা যে-সব সুযোগ-

সুবিধা পাচ্ছিল সেগুলো নষ্ট হয় দেখে, জননায়কদের ভয় পাওয়াবার জন্য রাজপক্ষীয়েরা প্যারিসে সৈন্য সমাবেশ করলো। নগরবাসীরা এতে ক্ষিপ্ত হয়ে প্যারিসের কুখ্যাত কারাগার 'ব্যাস্টিল' ধ্বংস করলো (১৪ই জুলাই ১৭৮৯)। সশস্ত্র বিপ্লব সুরু হয়ে গেল।

ধর্মযাজকেরা শাসন-সংস্কারের বিরোধিতা করছিলেন, ফরাসী জাতায় মহাসমিতি চার্চের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলো।

রাজা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু জনতা তাঁকে কারাগারে বন্দী করলো। অভিজাতরা এবার নিজেদের বিপদ বুঝতে পারলো, অনেকে দেশ ছেড়ে পালালো, অনেকে ধরা পড়ে গিলোটিনে প্রাণ দিল।

প্রুসিয়া ও অস্ট্রিয়া প্রতিবেশী-রাজ্য, সেখানকার অভিজাতরা জনসাধারণের এই বিদ্রোহ পছন্দ করতে পারলো না, তাদের দেশেও পাছে এই ভাবধারা সংক্রামিত হয় সেই ভয়ে ফরাসী-বিপ্লবকে ধ্বংস করার জন্য তারা সৈন্য পাঠালো। কিন্তু ফরাসী প্রজাদের হাতে প্রুসিয়ান ও অস্ট্রিয়ান সেনা হেরে গেল।

জনসাধারণের আদালত 'কনভেনসনের' নির্দেশে রাজা, রাণী ও রাজপুত্রেরা গিলোটিনে প্রাণ হারালেন। অসংখ্য বড়লোকেরও গিলোটিন হোল। যে জমিদার বা অভিজাত, গরীব প্রজাদের উপর কোন রকম অত্যাচার করেছিল তারই বংশসুদ্ধ লোপ পেল।

নতুন নীতিতে নতুন আইন-কানুন অনুযায়ী ফরাসী প্রজাতন্ত্রের পত্তন হোল, গরীব জনগণের বাঁচবার অধিকার স্বীকৃত হোল।



ক্রীতদাসদের স্বাধীনতা

মানুষ কেনা-বেচার প্রথা জগতের কোন্ দেশে প্রথম সুরু হয়েছিল আজ তা বলা সহজ নয়। মহাভারতের যুগে রাজা হরিশ্চন্দ্রের আত্মবিক্রয় করে ঋণ শোধ করার কথা আমরা পড়েছি। কিন্তু আমেরিকা ছাড়া আর কোন দেশে ক্রীতদাসদের মুক্তি দেবার জন্য কোন সংগ্রাম করতে হয়নি। এই লড়াই চলে পুরো চারটি বছর—১৮৬১ থেকে ১৮৬৫ সাল অবধি।

আমেরিকায় দাসপ্রথা সুরু হয় ১৪৪২ সালে। ১৭৯১ সালে দেখা গেল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ৩৮০০০ ক্রীতদাস আছে।

এই ভাবে দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধির সবচেয়ে বড় কারণ হোল আমেরিকানদের আলস্য। দেশটা চাষ-আবাদের দেশ, কিন্তু মানুষগুলোর খাটবার ইচ্ছা একান্ত কম। বিনা খরচে অপরকে খাটিয়ে নেবার প্রবল আগ্রহ তাদের মধ্যে সংক্রামক রোগের মত ব্যাপক হয়ে ওঠে। নিষ্ঠুরতাও ক্রমশঃ সীমাহীন হয়ে ওঠে। ওহিও নদীর দক্ষিণ দিকের রাষ্ট্রগুলিতে জমির উর্বরতা বেশী, সেইখানেই দাসপ্রথা চরমে গিয়ে পৌঁছায়।

এই নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে প্রথম সাড়া তোলেন 'লিবারেটর' নামে একখানি কাগজ। ১৮৩১ সালের ৩১শে জানুয়ারী তারিখে লয়েড-গ্যাবিসন এই কাগজে লেখেন—অন্যায়কে অন্যায় বলতে হবে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস রাখতে হবে।

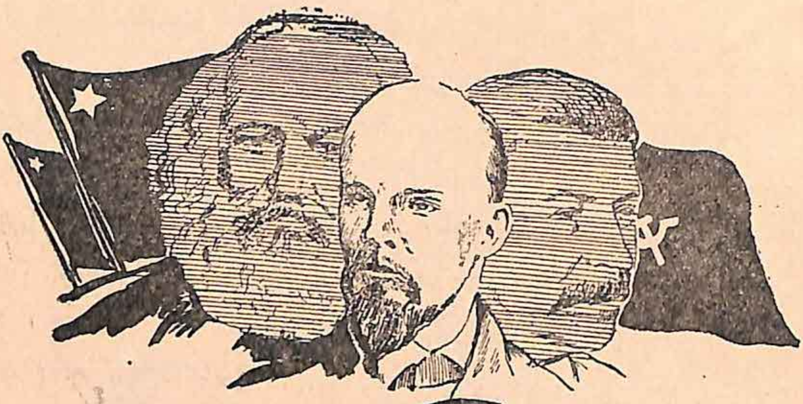
এই থেকেই মুক্তি আন্দোলন সুরু হয়ে গেল। আন্দোলনকারীদের কেহ কেহ দাসপ্রথা সমর্থকদের হাতে গুলি খেয়েও মারা গেল।

দাসপ্রথা বিরোধীদলের নেতৃত্ব নিলেন জন-ব্রাউন। তাঁর কয়েকটি ছেলে এই সম্পর্কে প্রাণ হারালো। সামান্য ক'জন অনুচর নিয়ে তিনি ভার্জিনিয়ার হার্পার্স্-ফেরীর অস্ত্রাগার লুঠ করলেন, সেই অস্ত্র নিয়ে দাসপ্রথার সমর্থকদের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন বলে। কিন্তু তেমন কিছু করার আগেই ধরা পড়ে তাঁর ফাঁসী হয়ে গেল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তখন তেরোটি রাষ্ট্র ছিল। ১৮৬০ সালে তারা দুটী দলে ভাগ হয়ে গেল। উত্তরের সাতটি রাষ্ট্র বললো—দাসপ্রথা তুলে দাও, দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলি আপত্তি তুললো। ১৮৬১ সালে দু'দলে লড়াই সুরু হয়ে গেল।

চার বছর লড়াই চললো। ছোটখাটো অসংখ্য সংঘর্ষে সব শুদ্ধ পাঁচ লাখ লোক নিহত হোল, আহত হোল আরো কত। শেষে দক্ষিণ রাষ্ট্রগুলি পরাজয় মানলো। রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম-লিঙ্কন আমেরিকায় দাসপ্রথা রহিত করে দিলেন, তিনি ঘোষণা করলেন—একজনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার উপর জুলুম চালাবার অধিকার আরেকজনের নেই।...দু'দশ জন মানুষকে সারা জীবন হয়তো বোকা বানিয়ে রাখা যায়, কিন্তু চিরদিন সবাইকে বোকা বানিয়ে রাখা যায় না!...

দক্ষিণীদলের যত রাগ গিয়ে পড়লো যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতির উপর। যুদ্ধ শেষের সাতদিন পরে এক রঙ্গালয়ে লিঙ্কন 'জুলিয়াস-সিজার' অভিনয় দেখছিলেন, এমন সময় গুপ্ত ঘাতকের গুলিতে তিনি নিহত হলেন।



রুষ বিপ্লব

রুশিয়ার রাজা আর বড়লোকেরা যেভাবে রাজ্য চালাতেন তাতে গরীব লোকদের দুঃখের আর শেষ ছিল না, অনাচার সইতে সইতে শেষে প্রজারা একদিন ক্ষেপে উঠলো।

প্রজাদের বিপ্লবী মনকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেবার জন্য জার (রাজা) জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে দিলেন, কিন্তু তৈরী হয়ে নামেন নি, হেরে গেলেন। এবার প্রজাদের অসন্তোষ চরমে উঠলো, ধর্মঘট সুরু হোল চারিদিকের কলকারখানায়, বিদ্রোহ দেখা দিল সৈন্য-ব্যারাকে আর নৌ-বিভাগে।

রাজধানী সেন্টপিটার্স-বার্গে মজুরেরা পঞ্চায়েৎ গড়ে তুললো। এই পঞ্চায়েৎ স্থির করলো—জারকে রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করতে হবে,·· মজুরেরা দিনে আট ঘণ্টার বেশী কাজ করবে না,···সংবাদপত্রের উপর জারের বিধি-নিষেধ মানা হবে না···

কিন্তু এই পঞ্চায়েৎ টিকলো না, পুলিশের গুলিতে কতজন মরলো, আবার কতজন গেল নির্বাসনে।

কিছুদিন সব চুপ চাপ।

তারপর হোল লেনার সোনার খনিতে ধর্মঘট। ধর্মঘটী মজুরদের

উপর পুলিশ গুলি চালালো। তার প্রতিবাদে রুশিয়ার সর্বত্র মজুরেরা ধর্মঘট করলো; কিন্তু তখনও একত্রে বিপ্লব ঘটাবার মত সামর্থ্য মজুরদের হয়নি।

প্রথম মহাসমর এলো। রুশিয়া জার্মানির বিরুদ্ধে লড়তে নামলো।

কিন্তু লড়তে লড়তে দেশ নিঃস্ব হয়ে পড়লো—খাবার নেই, শীতের পোষাক নেই। নগরে নগরে দেখা দিল ভুখ্-মিছিল।

এদিকে বড়লোকেরাও বিরক্ত হয়ে উঠেছিল, রাজা নিজে কিছু করতেন না, তাঁকে পরামর্শ দিতেন রাসপুটিন নামে এক ভণ্ড সাধু।

সীমান্তে সৈন্যরাও জার্মানদের কাছে হেরে পিছুতে লাগলো।

এবার সত্যই বিদ্রোহ দেখা দিল। জার চেষ্টা করলেন বিদ্রোহ দমন করতে, কিন্তু পারলেন না। তাঁকে সিংহাসন ছেড়ে দিতে হোল।

নতুন গবর্মেণ্ট গড়ে উঠলো, তার নেতা হলেন কেরেনস্কি। কিন্তু তিনি দেশের অবস্থা ভালো করতে পারলেন না। চাষী ও মজুরেরা আবার নতুন করে পঞ্চায়েৎ গড়ে তুললো। তাদের নেতৃত্ব নিলেন লেনিন।

৭ই নভেম্বর মজুর ও সৈনিকেরা রাজধানী ঘিরে ফেললো। কেরেনস্কি পালিয়ে গেলেন, বিপ্লবীরা রাজধানী দখল করে বসলো। লেনিন ছিলেন স্বইট্জারল্যাণ্ডে। তিনি দেশে ফিরলেন। দলের সভা বসলো, নতুন গবর্মেণ্ট তৈরী হোল, লেনিন হলেন তার প্রেসিডেণ্ট, ট্রটস্কি হলেন তার পররাষ্ট্র সচিব। লেনিন ঘোষণা করলেন—জমির মালিক হবে চাষীরা, কারখানা হবে মজুরদের, ইতিহাসের পাতায় আর নতুন কোন জারের নাম কোনদিন শোনা যাবে না।

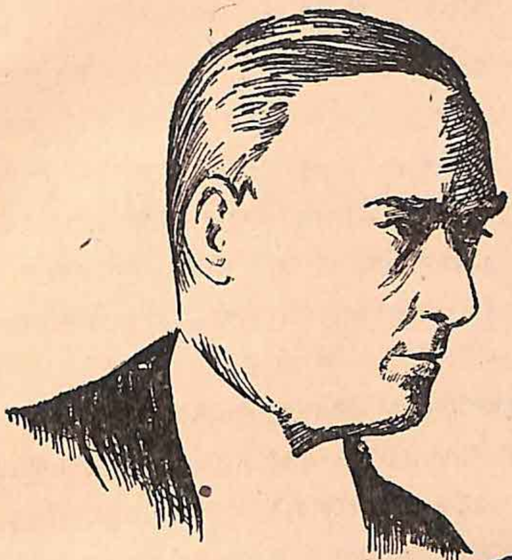
কিন্তু বড়লোকেরা দেখলো এবার সব যায়, বিদেশী ধনীদের সাহায্য নিয়ে তারা লেনিনের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে দিল।

লেনিনের দল ক্রমশঃ হারতে লাগলো।

লেনিনের দল—'বলশেভিকদের' হাতে জার তখনও বন্দ। হয়েছিলেন, ধনীরা যদি তাঁকে একবার ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দেয়

তাহলেই সব নষ্ট হয়ে যাবে, এই ভেবে পঞ্চায়েৎ রাজা-রাণী ও রাজপুত্রদের ফাঁসী দিয়ে দিল। লেনিন যখন খবর পেলেন, তখন আর তাঁর করার কিছু নেই।

এদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেল ; ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইতালি, পোল্যাণ্ড, সার্বিয়া, রুমানিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, জাপান ও বল্‌টিক রাজ্যগুলি একজোট হয়ে রুশিয়াকে আক্রমণ করলো, সাইবেরিয়া—ক্রিমিয়া—বলটিক সাগর অবধি চললো লড়াই। কিন্তু একবছর লড়েও তারা রুশ সেনাপতি ট্রট্‌স্কিকে কাবু করতে পারলো না। ব্যর্থকাম হয়ে সব বিদেশী সৈন্যেরা দেশে ফিরে গেল, বড়লোকেরাও সব পালালো। ট্রট্‌স্কির চেষ্টায় রুশিয়ার কুলিমজুরদের গবর্মেণ্ট সুপ্রতিষ্ঠিত হোল। বলশেভিকরা দেশটার নাম অবধি বদলে দিল ঃ পঞ্চায়েতী প্রজাতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র—ইউনিয়ন অফ সোভিয়েট সোশ্যালিষ্ট রিপাব্‌লিক্‌স্।



তুরস্কে বিপ্লব

তুরস্কের বাদশা ছিলেন আবদুল হামিদ। নিজের সুখ-সুবিধা নিয়েই তিনি মেতে থাকতেন, প্রজাদের দিকে দৃষ্টি দেবার মত সময় তাঁর ছিল না। প্রজারা এদিকে নিজেদের অবস্থার উন্নতি করার জন্য উৎসুক। সুলতানের ভয়, কখন প্রজারা বিদ্রোহ করে বসে, তাই সারা দেশ তিনি গুপ্তচরে ছেয়ে ফেললেন, সুলতানের বিরুদ্ধে কোথায় কে কি করছে জানার জন্য। কারুর একটু দোষ পেলে হয়, সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার··· বিচার···জেল। তরুণেরা এই অনাচার সইবে কেন? তারা পণ করলো তুরস্ককে তারা নতুন করে গড়ে তুলবেই। তারা 'মুক্তি-সঙ্ঘ' নামে একটি দল গড়ে তুললো। দলের একখানি হাতে লেখা কাগজ বেরুলো, সেই কাগজখানি পড়ে ছেলেরা দলের কার্য-পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য জানতে পারতো। এই কাগজের অধিকাংশ লেখাই লিখতেন মুস্তাফা কামাল পাশা নামে সামরিক ইস্কুলের একজন ছাত্র।

চরের মুখে বাদশার কানে এ কথা উঠলো, কলেজের কর্তৃপক্ষকে স্থলতান আদেশ দিলেন—ছাত্রদের সংযত কর!

কামালকে কলেজ ছাড়তে হোল। তবু তিনি দমলেন না। এক ভাড়াটে বাড়ীতে মুক্তিসজ্ঘের এক আপিস খুলে বসলেন। গুপ্তচরেরা তাঁর উপর চোখ রেখেছিল, একদিন এক অচেনা লোক এসে বললো—বড় অভাব, খেতে পাই না, কিছু সাহায্য করুন—আজকের রাত্রির জন্য একটু আশ্রয় দিন।

ছেলেটি সেই রাত্রে সেখানেই রইল। কামালের দলের কাউকেই তার চিনতে আর বাকী রইল না। পরদিন সকালে সে একেবারে পুলিশ নিয়ে এসে হাজির হোল, একে একে দলের সকলকে সে ধরিয়ে দিলে। বিচারে কামালের চার মাস জেল হোল, দলের কেউই বাদ গেল না।

কামালই ছিল দলের সর্দার। যেদিন তিনি জেল থেকে মুক্তি পেলেন, সেই দিনই স্থলতান তাঁকে এক চাকরী দিলেন—রাজ্যের শেষ প্রান্তে স্থদূর সিরিয়ায় এক সেনানায়কের পদ। সেখানে কিছুদিন কাজ করার পর কামালের ভালো লাগলো না, দেশে ফিরতে চাইলেন। কিন্তু স্থলতান তাঁকে ছুটী দিলেন না। কামাল ছদ্মবেশে সালানিকায় ফিরে এলেন। সেখানে গুপ্ত সমিতি গড়ে তুললেন। কিন্তু ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল, কামাল আবার ফিরে গেলেন সিরিয়ায়।

বছর তিনেক বাদে ছুটী মিললো, কামাল সালানিকায় ফিরলেন। তখন তুরস্কে অনেক ছোট ছোট বিপ্লবী দল গড়ে উঠেছে। আনোয়ার পাশা, তালাৎ পাশা প্রভৃতির দলকে একত্র করে তিনি একটি বড় দল গড়লেন—'ঐক্য ও প্রগতি সঙ্ঘ'—সোসাইটী অফ্ ইউনিয়ন এণ্ড প্রগ্রেস্। উদ্দেশ্য হোল তুর্কীকে নতুন করে গড়ে তোলা।

তুরস্ক ছিল দুর্বল রাষ্ট্র, জার্মানি ও রুশিয়া তুরস্ককে জয় করে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবার এক ষড়যন্ত্র করলো। কিন্তু কামাল পাশার তরুণ দলকে দেখে তারা চমকে উঠলো। স্থলতানকে বোঝালো—ওদেরকে দমন কর।

কিন্তু সুলতান কিছু করার আগেই তরুণদল বিদ্রোহ করলো। সুলতানের সেনাদলকে তারা হারিয়ে দিল, আব্দুল হামিদকে সরিয়ে দিয়ে তার ভাই বেশাদকে সিংহাসনে বসানো হোল।

এদিকে ইউরোপের বুকে আগুন জ্বলে উঠলো, বিশ্ব-যুদ্ধে তুরস্ক জার্মানির সঙ্গে যোগ দিল। কামাল হলেন সেনানায়ক। দার্দানেলিশ, প্যালেস্টাইন, গ্যালিপলি ও কুট-অল্-আমেরা—চারিটি প্রচণ্ড যুদ্ধে ইংরেজ সেনাদের কামাল হটিয়ে দিলেন, সেনাপতি টাউনসেণ্ড বন্দী হলেন। কিন্তু শেষে জার্মানি পরাজয় মানলো, ইংরেজ, ফরাসী, ইতালিয়ান ও মার্কিনরা চেপে ধরলো তুর্কীকে—তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র যা আছে সব আমাদের হাতে তুলে দাও।

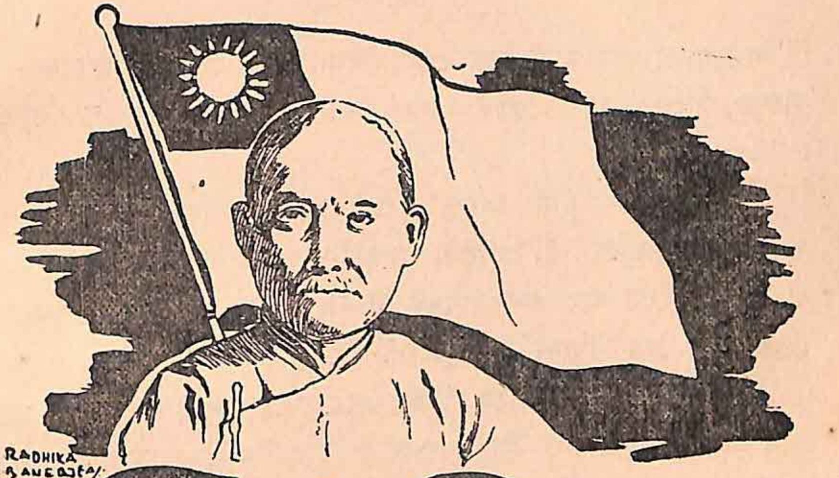
কামাল চমকে উঠলেন—সব অস্ত্র-শস্ত্র শত্রুর হাতে তুলে দিলে আত্মরক্ষা করবে কি করে? জবাব পাঠালেন—সব অস্ত্র যোগাড় করতে হলে আমাদের ক'দিন সময় চাই।

সময় পাওয়া গেল, সমস্ত সৈন্য-সামন্ত ও অস্ত্র-শস্ত্র একত্র করে কামাল আবির্ভূত হলেন আনাতোলিয়ায়। সে জায়গাটা তখন ফরাসীরা দখল করে বসেছিল, বন্দুকের ধাক্কা দিয়ে কামাল তাদেরকে হটিয়ে দিলেন। তারপর জাতীয় নেতাদের ডেকে এক কংগ্রেস বসালেন, কংগ্রেসে ঠিক হোল—পৃথিবীর বুক থেকে তুর্কী জাতি লুপ্ত হয়ে যায় সে-ও ভালো, তথাপি বিদেশীর কাছে তারা মাথা নত করবে না। এক জাতীয়-পরিষদ গড়ে উঠলো। সুলতানের কাছে তারা লিখলো—প্রধান মন্ত্রী দামাদ ফরিদকে তাড়িয়ে দিন।

ইংরেজ, ফরাসী, ইতালী চম্‌কে উঠলো। হুড়মুড় করে সৈন্য নিয়ে এসে তারা কন্‌স্টান্টিনোপল্ দখল করে ফেললো। সুলতান ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি এক সন্ধি করে বস্‌লেন, কামালের দল কিন্তু সেই সন্ধি মানলো না। 'আঙ্গোরায়' কুড়ি দিন লড়াই চালিয়ে তাঁরা ইংরেজদের হটিয়ে দিলেন। গ্রীকরা স্মার্ণা, থ্রেস, আনাতোলিয়া ও এশিয়া-মাইনর দখল করেছিল, কামাল তাদেরকেও হটিয়ে দিলেন। আনন্দে তুর্কীরা তাঁকে

'গাজী' উপাধি দিয়ে দিলে। সুলতান ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলেন। প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হোল, রাষ্ট্রপতি হলেন—গাজী মুস্তাফা কামাল পাশা (১৯শে অক্টোবর, ১৯২৩)।

কামাল পাশা বললেন—নিজেরা আগে বাঁচি তার পর ধর্মের কথা ভাববো—first we are Turks then we are Mohommedans। সমস্ত মুসলমানী নিয়ম-কানুন বদলে তিনি য়ুরোপীয় ধারায় দেশকে গড়ে তুললেন। লুঙ্গী ও ফেজ পরা বন্ধ হোল, মেয়েদের বোর্খা ছেড়ে পথে বেরুতে হোল, আরবী অক্ষর ছেড়ে এ, বি, সি, ডি, অক্ষর লেখা সুরু হোল, ধর্মগুরু খলিফার পদ তুলে দেওয়া হোল, খাঁ, সেখ, পাশা প্রভৃতি আরবী পদবী তুলে দিয়ে নামের পাশে তুর্কী পদবী লেখার নিয়ম হোল,—গাজী মুস্তাফা কামাল পাশা হলেন কামাল আতাতুর্ক। কামাল বললেন—আমরা যে প্রাচ্যের লোক একথা ভুলতে হবে। চীন, ভারত, আরব, মিশর, পারস্য বর্তমান থেকে অনেক পিছিয়ে আছে, তাদের পানে তাকিয়ে থাকলে আমরাও পিছিয়ে যাব, আমাদের পতন হবে। বর্তমান যুগে আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হলে য়ুরোপের সঙ্গে সমতালে পা ফেলে চলতে হবে. তাদের সমকক্ষ না হতে পারলে তাদের হাতেই আমাদের মৃত্যু।



চীন বিপ্লব

মাঞ্চুরাজারা চীনে রাজ্যে করতো, চীনদেশে তারা ভালো কিছু করার চেষ্টা করেনি, খাজনা আদায় ক'রে আর পার্ষদদের তোষামুদী শুনেই তারা খুসি ছিল। এই সুযোগে বাহিরের শক্তিশালী জাতিরা—ইংরেজ, ফরাসী, আমেরিকা ব্যবসায়ের নামে চীনাদের সম্পদ লুঠ করে নিচ্ছিল। পাছে চীনারা সজাগ হয়ে উঠে সেইজন্য তাদেরকে জোর করে আফিম খাইয়ে রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। চীনারা আপত্তি তুললো, তা নিয়ে লড়াইও হোল, কিন্তু চীনারা হেরে গেল, তার ফলে আফিম খাওয়া ও মাথায় বেণী রাখা স্বীকার করে নিতে হোল।

আফিম খাইয়ে টিকিধারী চীনাদের বুকে বিদেশীরা যখন সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখছে, তখন একদল বিপ্লবী মহা-চীনের শহরে শহরে ঘুরে ঘুমভাঙানো গান শোনাচ্ছিল। এই দলের নেতা ছিলেন একজন আমেরিকা-ফেরৎ ডাক্তার—সান-ইয়াৎ-সেন। তাঁর দলের নাম দেওয়া হয় 'ইউনাইটেড লীগ', প্রথম বছরেই এই দলে দশ হাজার কর্মী যোগ দেয়

ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল, চীনা-সম্রাট ঘোষণা করলেন—যে ডাক্তার সানের মাথা কেটে আনবে তাকে অনেক টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

জাপানে অনেক চীনা আছে, আমেরিকাতেও আছে। ডাক্তার সান জাপান থেকে আমেরিকা গেলেন, সেখানে চীনের জাতীয় আন্দোলনকে সার্থক করে তোলার জন্য অনেক টাকা সংগ্রহ করলেন। মাঞ্চুরাজার গুপ্তঘাতকও তাঁর পিছন পিছন ঘুরলো, তাঁকে হত্যা করার চেষ্টাও করলো।

বিপ্লবী কর্মীরা নানা স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে সশস্ত্র অভ্যুত্থান করে। ক্রমে ক্রমে সরকারী সৈন্যরাও বিপ্লবীদের দলে যোগ দিল। সতেরোটি প্রদেশে বিপ্লবীরা একত্র হয়ে মাঞ্চুরাজার বিরুদ্ধে জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলো। নানাকিং শহরে হোল তাদের রাজধানী আর রাষ্ট্রপতি হলেন ডাক্তার সান। মাঞ্চুরাজা এই অভ্যুত্থানকে বাধা দিতে সাহসী হলেন না, সিংহাসন ছেড়ে দিলেন। রাজা হলেন য়ুয়ান-শি-কাই।

য়ুয়ান-শি-কাই বিপ্লবীদের সঙ্গে আপোষ করে নিজেকে চীনের সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু বেশীদিন তাঁর রাজ্য করা চললো না, বছর খানেকের মধ্যেই তিনি মারা গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর চীনে যত সেনাপতি ছিল সবাই বিদ্রোহ ঘোষণা করে ডাকাতি স্থুরু করলো। চীনে এক প্রচণ্ড অরাজকতা দেখা দিল।

দক্ষিণ চীনে তখন বিপ্লবী চীনা জাতীয় দল—'কুও-মিন-টাং' একটু গুছিয়ে বসেছে। উত্তরের অরাজকতা বন্ধ করার জন্য ডাক্তার সান রুশিয়া থেকে জেনারেল বরোডিনকে আনালেন। বরোডিন বিপ্লবীদেরকে রীতিমত সামরিক কায়দায় শিক্ষিত করে তুললেন। জাতীয় বাহিনী উত্তর চীনে অগ্রসর হোল। উত্তরের দস্যুদল এবার বিপদ দেখে ডাক্তার সানকে খুন করার ষড়যন্ত্র করলো। কিন্তু তাদের সঙ্গে রীতিমত একটা বোঝাপড়া করার আগেই পিকিনের এক হোটেলে হার্টফেল করে ডাক্তার সান মারা গেলেন (১২ই মার্চ ১৯২৫)।

ডাক্তার সানের পর নেতা হলেন চিয়াং-কাই-শেক। বছর তিনেকের

মধ্যেই তিনি উত্তর চীন জয় করলেন, কিন্তু চীনদেশে শান্তি ফিরে এলো না, কমিউনিস্টদের সঙ্গে তাঁর মতে মিললো না, আবার এক ঘরোয়া বিবাদ সুরু হোল। ১৯২৭ সাল থেকে সেই বিবাদ চললো। মাঝে জাপানী আক্রমণের সময় দু'দলে একত্র হয়ে জাপানের বিরুদ্ধে লড়াই চালালো কয়েক বছর। কিন্তু জাপানের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই পুরানো গৃহ-বিবাদ দেখা দিল। এই বিবাদের ফলে লাখ লাখ কমিউনিস্টকে মৃত্যুবরণ করতে হলো, চিয়াংয়ের সৈন্যরা অনেক অত্যাচার করলো, অনেক গ্রাম উৎসন্নে গেল। দেশে কোথাও শান্তি নেই। যে টাকা দেশের পুনর্গঠনের জন্যে খরচ করা চলতো, তা গুলি-গোলা ও বোমায় খরচ হতে লাগলো। দু'দলেরই জেদ চেপে গেল। ডাক্তার সান-ইয়াৎ-সেন চল্লিশ কোটি চীনাদের যে সুখ ও সমৃদ্ধির আশা করেছিলেন (সান-মিন-চু-আই), ডাক্তার সানের অন্যতম সহকর্মী জেনারেলিসিমো চিয়াং-কাই-শেক সেই সম্ভাবনাকে দূরে ঠেলে দিলেন। ক্ষমতার মোহ তাঁকে চেপে ধরলো।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি থাকতে পারলেন না, মাও-সে-তুং-এর নেতৃত্বে কমিউনিস্টরা তাঁকে দেশ থেকে তাড়ালো এবং নতুন গবর্মেণ্ট গঠন করলো। চিয়াং পালিয়ে গেলেন চীন-সাগরের এক দ্বীপে—ফরমোজায়। তবে চীনা কমিউনিস্টদের কাছ থেকে যে মানবতা-বোধের আশা আমরা করেছিলাম তা পাওয়া গেলনা, চীনারা তিব্বত দখল ক'রে সেখানে রক্তস্রোত বহালো, তারপর ভারতবর্ষের সীমান্তে সংঘর্ষ বাধালো—হাজার হাজার বছরের প্রীতি ও হৃদ্যতার কোন মর্যাদা তারা রাখতে পারলো না।



আয়র্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা

ইংলণ্ডের পাশে আয়র্ল্যাণ্ড একটি দ্বীপ। এই দ্বীপটিকে নিজেদের সঙ্গে যুক্ত করে ইংরেজরা নাম দিয়েছে—বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ। তিরিশ লাখ আইরিশ কিন্তু নিজেদেরকে বৃটিশ বলে ভাবে না, ইংরেজদের অধীনে নিজেদেরকে এক পরাধীন জাতি বলে মনে করতো। সেইজন্য ইংরেজদের অধীনতা থেকে স্বাধীন হবার জন্য তারা অনেকবার বিদ্রোহ করে, কিন্তু কোনবারেই তারা বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারেনি। তারা শুধু সুযোগ খুঁজছিল কখন ইংরেজরা বিপদে পড়বে, আর সেই ফাঁকে আইরিশরা স্বাধীন হয়ে যাবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আইরিশ বিপ্লবীরা (সিনফিন) সুবিধা পেয়ে গেল। জার্মানি থেকে এক জাহাজ অস্ত্র এসে লাগলো হাউথ-বন্দরে। দলের নেতা ছিলেন ইমন-ডি-ভেলেরা। জাহাজ থেকে গুলি গোলা বোমা বন্দুক হস্তগত করে সদলবলে যখন তিনি ফিরছেন এমন সময় খবর পেয়ে পুলিশ গেল তাঁদেরকে ধরতে। ডাবলিনের রাজপথে তু'দলে দেখা হোল। পুলিশের সঙ্গে বিপ্লবীদের দাঙ্গা বেধে গেল। পুলিশ গুলি চালালো, কত নিরীহ লোক মরলো, কিন্তু কোন বিপ্লবী ধরা পড়লো না।

ইস্টারের ছুটিতে আয়র্ল্যাণ্ডের চারিদিক থেকে সাতশো বিপ্লবী এসে জড়ো হোল ডাবলিন শহরে। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গিয়ে সকাল দশটার সময় তারা রাজধানীতে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। জার্মানির দেওয়া বন্দুক আর কামান নিয়ে রীতিমত লড়াই চললো সাতদিন। বিপ্লবীরা হেরে গেল, নেতারাও ধরা পড়লো, সকলেরই যাবজ্জীবন জেল হোল।

এক বছর পরে ইংরেজরা বিপ্লবীদের ছেড়ে দিয়ে বললো, তোমাদের সৈন্য দিতে হবে। ডি-ভেলেরা সৈন্য দিতে রাজী হলেন না। ইংরেজরা আবার সব বিপ্লবীদেরকে ধরে জেলে দিল। বিপ্লবী-বন্ধু মাইকেল কলিন্সের বুদ্ধির জোরে ডি-ভেলেরা জেল থেকে পালিয়ে গেলেন আমেরিকাতে। লড়াই তখন শেষ হয়ে গেছে। ইংরেজ, ফরাসী ও মার্কিনরা শান্তি-বৈঠক বসিয়ে কাগজে বড় বড় কথা প্রচার করছে— 'আমরা সমস্ত অন্যায় অবিচারের প্রতিবিধান করবো, পরাধীনদের স্বাধীন করে দোব।' ডি-ভেলেরা বললেন—'বেশ, তাহলে আয়র্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা দাও।' কিন্তু সে কথার কোন উত্তর মিললো না। ডি-ভেলেরা তখন মার্কিনদের কাছে বক্তৃতা দেওয়া স্বুরু করলেন।

আইরিশরা এদিকে ইংরেজদের বয়কট করতে স্বুরু করেছে। নিজেরা আদালত বসালো। পঞ্চায়েৎ বসিয়ে বিচার স্বুরু করলো। আইরিশ সেচ্ছাসেবকেরা পুলিশের কাজ চালাতে লাগালো। ইংরেজের আদালত বন্ধ হোল, ইংরেজ পুলিশের কোন কাজ রইল না। ইংরেজরা রাগে ফুলতে লাগলো। যে-সব গুণ্ডা জেলে ছিল তাদেরকে নিয়ে এক সৈন্যদল গড়ে আয়র্ল্যাণ্ডে পাঠালো। গুণ্ডার দল শহর লুঠ করলো, যাকে খুসি গুলি করে মারলো। এই সব অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিবাদে কর্ক শহরের মেয়র টেরেন্স-ম্যাক্সুইনি ব্রিকস্টন জেলে ৭৪ দিন উপবাস করে দেহত্যাগ করলেন (২৪শে অক্টোবর ১৯২০)। সমস্ত আয়র্ল্যাণ্ড এবার ইংরেজদেরকে ট্যাক্স্ দেওয়া বন্ধ করে দিল। ডি-ভেলেরা আমেরিকা থেকে অনেক টাকা চাঁদা তুলে ইংরেজ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে

আয়র্ল্যাণ্ডে ফিরে এলেন। আয়র্ল্যাণ্ডে ব্যাপকভাবে বিপ্লব দেখা দিল।

ইংরেজরা অনেক চেষ্টা করেও যখন অবস্থা আয়ত্তে আনতে পারলো না, তখন তারা আইরিশ নেতাদের ডেকে পাঠিয়ে একটা রফা করে ফেললো। ইংরেজরা আয়র্ল্যাণ্ডকে স্বায়ত্ত-শাসন দিল,—শুধু পঞ্চম জর্জকে রাজা বলে মানতে হবে। ১৯৩২ সালে ডি-ভেলেরা এই বাধ্য-বাধকতাটুকুও উঠিয়ে দেন। তবে আয়র্ল্যাণ্ডের উত্তরাংশে আল্‌স্টার বলে একটি অঞ্চল এখনও স্বাধীন 'আয়ারে' যোগ দেয় নি। ডি-ভেলেরা হলেন 'আয়ারের' সর্বময় কর্তা। তাঁর দলের নাম 'ফিয়ানাফেল্'— আয়র্ল্যাণ্ডের সৈনিক।



ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা

পরপর তিনটি যুদ্ধে ইংরেজরা ব্রহ্মদেশ অধিকার করে,—১৮২৬ সালে আরাকান ও তেনাসারিম, ১৮৫২ সালে পেগু, ১৮৮৫ সালে মন্দালয়। ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত করে তারা রাজ্য চালায়। কংগ্রেস যখন ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন চালায়, ব্রহ্মীদের মনে সাড়া তোলার জন্য গান্ধীজী, যতীন্দ্রমোহন, সুভাষচন্দ্র ও জওহরলাল তখন ব্রহ্মদেশেও যান।

ব্রহ্মীদের মাঝে প্রথম যুব-আন্দোলন আসে—'বৌদ্ধ যুব সংঘের' ভিতর দিয়ে। তারপর একে একে অনেকগুলি দল দেখা দেয়—দোবামা আসিওন, থাকিন, সিনইয়েথা, চিংলিয়াং ও মিওচিৎ। এই সব দলের মধ্যে দুটি মতবাদ দেখা দেয়—একদল ভারতের সঙ্গে যুক্ত থাকতে চায়, আরেক দল চায় ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে। ভিক্ষু উত্তম ছিলেন প্রথম দলের নায়ক।

ইংরেজরা দেখলো এই সুযোগ। দুটি দেশকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলে রাজ্য রক্ষার সুবিধা হবে, 'শাদা কাগজের' আইনে তারা ভারত থেকে ব্রহ্মীদেরকে আলাদা করে ফেললো। বা-ম', উ-স' প্রভৃতি মন্ত্রীত্ব সুরু করলেন।

১৯৩৯এর মহাসমর সুরু হতেই মিওচিং দলের নেতা উ'-স' জাপানের সঙ্গে সহযোগিতা করার চেষ্টা করেন। ইংরেজরা তাঁকে ধরে উত্তর আফ্রিকার উগাণ্ডায় আটকে রাখে।

ছাত্র-নেতা আউঙ্গ-সান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ত্রিশজন সঙ্গী নিয়ে জাপান চলে যান। জাপানীরা ব্রহ্মদেশ দখল করার পর তিনি ফিরে এলেন, সঙ্গে আনলেন এক হাজার রাইফেল আর প্রচুর টাকা। ত্রিশ হাজার ছেলেকে নিয়ে তিনি রীতিমত এক ফৌজ গড়ে তুললেন—ব্রহ্ম মুক্তিফৌজ। কিন্তু জাপানীরা এই সঙ্ঘকে ভালো চোখে দেখলো না, কাজেই অল্প দিনের মধ্যেই এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নাম বদলে রাখা হোল—ব্রহ্ম রক্ষী-বাহিনী।

জাপানীদের হালচাল ভালো বলে মনে হচ্ছিল না। কমিউনিস্ট নেতা থাকিন-নু ও আউঙ্গ-সান দু'জনে মিলে গুপ্তভাবে জাপ-বিরোধী সংগঠন সুরু করলেন। দলের নাম হোল 'পূর্ব-এশিয়া তরুণ সঙ্ঘ'।

আউঙ্গ-সান জাপানীদেরকে বোঝালো যে তিনি জাপানের পক্ষে, এদিকে ইংরেজ ও আমেরিকানদের সঙ্গে গোপনে চুক্তি করে ফেললো। জাপানীরা যখন ব্রহ্মদেশ থেকে পিছু হটছে, তখন মিত্রপক্ষের দখল করার দু'দিন আগেই আউঙ্গ-সান রেঙ্গুন অধিকার করে বসলো।

কিন্তু যে আশা নিয়ে আউঙ্গ-সান মিত্রপক্ষের সহযোগিতা করেছিলেন তা হোল না। পালিয়ে-যাওয়া লাটসাহেব স্যার রেজিন্যাল্ড ডরমেন স্মিথ ফিরে এলেন এবং ব্রহ্মীদেরকে আয়ত্তে আনার জন্য ১৩৫০০ হাজার সাধারণ পুলিশ, ৭০০০ সশস্ত্র পুলিশ ও ৪০০০ সীমান্ত রক্ষী আমদানী করলেন।

জাতীয় নেতাদের গ্রেপ্তার করা হোল, কৃষক ও শ্রমিকদের সভায় গুলি চললো, মহিলাদের শোভাযাত্রার উপর পুলিশ লাঠি চালালো।

নিউলাইট অব-বর্মা, পাই-থু-আর-নার, আর-আর-নিট—তিনখানি খবরের কাগজ বন্ধ করে দিল।

জিনিষ-পত্রের দাম বেড়ে গেল দশগুণ, আর ব্রহ্মের সম্পদ লুঠ করার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হোল যত বিদেশী ধনিকেরা—জমানো দুধের কারবার গেল 'ইঙ্গ সুইডিশ মিল্ক কোম্পানির' হাতে, চিনির ব্যবসা করবে সাহেবদের 'বর্মা সুগার কোম্পানি' ও ভারতীয় 'জেয়াবর্দী সুগার ফ্যাক্টরি', সাবানের কারবার করবে 'লিভার ব্রাদার্স', দেশলাইয়ের কারবার করবে 'আদমজী হাজী দাউদ', সিগারেটের কারবার করবে 'ইম্‌পিরিয়াল টোবাকো কোম্পানি', পেট্রোলের কারবার চালাবে 'বর্মা অয়েল কোম্পানি', নদীর কর্তৃত্ব করবে 'ইরাবতী ফ্লোটিলা কোম্পানি', জঙ্গলের ইজারা পেলে 'বোম্বে বর্মণ ট্রেডিং কোম্পানি'।

আউঙ্গ-সানের দলকে ভেঙ্গে দেবার জন্য ইংরেজরা প্রস্তুত হোল, আউঙ্গ-সানও দলের নাম বদলে ফেললেন—ফ্যাসি-বিরোধী লীগ; সভাপতি হলেন আউঙ্গ-সান, সম্পাদক হলেন থানটুন। ষাট হাজার যুবক এই লীগের সদস্য হলো। আউঙ্গ-সান আইন-অমান্য-আন্দোলনের ঘোষণা করলেন।

ইতিমধ্যে বিলাতে মন্ত্রীসভা পালটে গেল, রাজনীতিও বদলে গেল। প্রধান মন্ত্রী এটিলী জেনারেল আউঙ্গ-সানকে নিমন্ত্রণ করলেন বিলাতে। সেখানে নতুন শাসননীতি ঘোষণা করা হোল। ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে গণ-পরিষদ গঠিত হল, নির্বাচনে ২০২টি আসনের মধ্যে ১৯৬টী আউঙ্গ-সানের দল দখল করলেন। ১৬ই জুন গণ-পরিষদ ব্রহ্মদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করলো। আউঙ্গ-সান হলেন প্রধান মন্ত্রী।

একমাস পরে জুলাই মাসে কয়েকজন যুবক আউঙ্গ-সান ও তাঁর মন্ত্রীদলকে গুলি করে হত্যা করলো। পরে জানা গেল উ-স' এর মধ্যে আছে, অন্তরালে ইংরেজ অফিসাররাও ছিল।

কিন্তু নেতাকে হত্যা করলেই একটা জাতির স্বাধীনতার ইচ্ছাকে নষ্ট

করা যায় না। ৩৪ বছরের আউঙ্গ-সানের কার্যভার গ্রহণ করলেন ৪০ বছরের থাকিন-নু।

৪ঠা জানুয়ারী আনুষ্ঠানিক ভাবে ব্রহ্মীরা ১২৩ বছরের পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করলো। ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ সেই উৎসবে যোগ দেন, এবং ভারতীয়দের শুভেচ্ছার প্রতীক হিসাবে বোধিবৃক্ষের একটি শাখা সেখানে রোপণ করেন।

ব্রহ্মদেশের রাজার সিংহাসনটি ছিল এদেশে, বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন সেটিকে স্বয়ং পৌঁছে দিয়ে এলেন রেংগুনে।

সন্ধানী

অনন্ত সিংহ ৮১
অনন্তহরি মিত্র ৭৬
অনন্ত তেলি ৭১
অনুকূল মুখুজ্যে ৫৭, ৭০
অনাথবন্ধু পাঁজা ৮৪
অনিল চ্যাটার্জী (মেজর জেনারেল) ৮৮
অবিনাশ ভট্টাচার্য ৬৭
অবনী মুখুজ্যে ৭৩
অমর চাটুজ্যে ৭৪
অমর নন্দী ৮০
অমূল্য আচার্য ৮২
অমূল্য রায় ৮৩
অমূল্য চৌধুরী ৮৩
অম্বিকা চক্রবর্তী ৭৮, ৭৯, ৮১
অযোধ্যা বিহারীলাল ৭
অরবিন্দ ঘোষ ৫, ২৪, ৫৮, ৬৩, ৬৪, ৬৭
অশোকচক্র, অশোকস্তম্ভ ১১৩
অশ্বিনীকুমার দত্ত ২১, ২২, ২৬, ৫৭
অষ্টম এডোয়ার্ড ৩১
অস্তি-ত্তে আন্দোলন ৪৯
(সর্দার) অজিত সিংহ ২৫
অর্ধেন্দু দাসগুপ্ত ৮০
অন্ধকূপ হত্যা ৪৮
অনুশীলন সমিতি ৫৭, ৬৯

আজাদ হিন্দ বাহিনী ১১, ৮৭
আজাদ হিন্দ গবর্মেণ্ট ৮৮
আজাদ হিন্দ মামলা ৯০
আজাদ হিন্দ রণসংগীত ৮৯
আজিজ আমেদ ৮৮
আনন্দ গুপ্ত ৮১
আনসারি (ডাক্তার) ১৩
আনি বেশান্ত ৭
আবুল কালাম আজাদ ১৩, ৭৫
আবদুল রব নিস্তার ১৫
আব্বাস তায়েবজী ৩৫
আব্রাহাম লিঙ্কন ১৩৬, ১৫১
আবদুল হামিদ (সুলতান) ১৫৫
আমীর চাঁদ ৭
আয়ার (এম. এ.) ৮৮ (দেশ) ১৬৪
আলেকজাণ্ডার ১২
আলি জাহির ১৩, ১৫
আলি খাঁ ৮৭
আরুইন (লর্ড) ৭৭
আসফ আলি ১৩, ১৬
আসানুল্লা ১০, ৮২
আসফাকউল্লা ৭৬
আশুতোষ বিশ্বাস ৬৭
আশু ভরদ্বাজ ৮৩
আহসান কাদির ৮৮
আউটরাম ১৪৩
আউঙ্গ সান ১৬৬
আনন্দমঠ ১৪
আত্মোন্নতি সমিতি ৫৭
আর আর নিট (পত্রিকা) ১৬৬

ইমন-ডি-ভেলেরা ১৬২, ১৬৩, ১৬৪
ইকবাল সইদই ৮৭
ইণ্ডিয়া হাউস ৫৬
ইণ্ডিয়া হোমরুল সোসাইটি ৫৬
ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ৪
ইণ্ডিয়ান সোশ্যালিস্ট (পত্রিকা) ৫৬
ইণ্ডিয়ান ন্যাশান্যাল পার্টি ৭২
ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৩৯, ১৪১, ১৪৩
ইয়েলাপ্পা ৮৮
ইশাক ৮৭

ঈশ্বর সিং ৮৮

উইলিয়ম কার্জন উইলি ৫৬
উজ্জ্বলা ১০
উধম সিং আজাদ ৮৫
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৪
উর্মিলা দেবী ৩১
উপেন বাঁড়ুজ্যে ৫৮, ৬৭
উল্লাসকর দত্ত ৫৮, ৬৭
উ-স' ১৬৬, ১৬৭

এ. এন. সরকার ৮৮
একক সত্যাগ্রহ ১০, ৩৯
এটিলি ১২, ১৬৭
এণ্ড্রু ফ্রেজার ৫৮
এন্টিসার্কুলার সোসাইটি ১৯
এলেন ৬০
এলাহাবাদে আন্দোলন ৪৮
এয়ারেস্ট (লেফ্‌টেন্যাণ্ট) ৫৬
এলিজাবেথ (রাণী) ১৪৭
এডোয়ার্ড (ক্যাপ্‌টেন) ১৪১

ঐক্য ও প্রগতি সঙ্ঘ ১৫৬

ওবেদুল্লা সিন্ধি ৭, ৭৫
ওব্রায়েন (কর্ণেল) ২৮
ওম্‌ আন্দোলন ৯৭
ওহাবী আন্দোলন ১৩
ওয়াভেল (লর্ড) ১৫, ১৬
ওয়াট্‌সন ৮৪
ওয়েব্‌ মিলার ৩৫
ওয়াট ১৪০
ওরবচন সিং ৮৭

ঔরংজীব ৫৫

কমললোচন নাইকো ৪৩
কমল মিরি ৪৬, ৪৭
কমরেড কতোয়াল ৫০
কনকলতা ৪৪
কনভেনসন ১৪৯
করিম গণি ৮৮
কলিন ক্যাম্‌বেল ১৪৩
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৪
কল্পনা দত্ত ৮২
কর্ণোয়ালিশ ১৪৭
কংগ্রেস সভাপতির তালিকা ১০৩
কামা (মাদাম) ৫৬, ১১২

কামাল পাশা ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮
কামাখ্যা ঘোষ ৮৪
কামাখ্যাপ্রসাদ সেন ১০
কামাগাটা মারু ৬৮
কাইজার-ই-হিন্দ্ (পদক) ২৯
কানাইলাল দত্ত ৬৪, ৬৫, ৬৬
কালী চক্রবর্তী ৮২
কালীপদ ভট্টাচার্য ৮৩
কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত ২০
কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ৫৮
কাসিম রেজভি ১০০
কার্জন ওয়াইলি (স্যার) ৬
কার্জন (লর্ড) ১৭
কাশীকার ৪৪
কাকোরী ষড়যন্ত্র ৭৬
কার্বি (মেজর) ২৮
কার্লাইল সার্কুলার ১৯
কাশ্মীরে আন্দোলন ৯৮
কিং (কম্যাণ্ডার) ৯২
কিংসফোর্ড ৬, ২৫, ৫৯, ৬০
কিচ্‌লু (ডাক্তার) ২৭
কিথ ১৪১
কিয়ানি (এম. জেড.) ৮৮
কুমিল্লার হত্যাকাণ্ড ৮৩
কুওমিন টাং ১৬০
কৃষ্ণকুমার মিত্র ৬, ১৮, ২৬
কৃষ্ণ মেনন ১৬
কৃষ্ণজীবন ৬৪
কৃষ্ণ চৌধুরী ৮২
কেনেডি ৬০
কেরেন্‌স্কি ১৫৩
কেশরী (পত্রিকা) ২৬
কোশল কানোয়ার ৪৬
কোপদিপোতার লড়াই ৭৪
ক্যাটেল ২০
ক্যানিং (লর্ড) ৯৫
ক্যাবিনেট মিশন ১২
ক্যামেরণ (লেফ্‌টেনেণ্ট) ১০, ৮১
ক্রীতদাসের ব্যবসা ১৪৬
ক্রিপ্‌স ৪০
ক্রেইগ্‌ ৮২

ক্ষুদিরাম বসু ৬, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩
খণ্ডিত ভারত ১২৩
খান আবদুল গফুর খাঁ ৫২
খিলাফত আন্দোলন ১৩
খুন-জখমের হিসাব ৫২
খোদাই খিদ্‌মৎগার ৫২

গজনফর আলি ১৫
গণেশ দামোদর সাভারকর ২৫, ৫৭
গণেশ ঘোষ ৮১
গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থী ১৭, ২৩
গডফ্রে (এডমিরাল) ৯২, ৯৩, ৯৪
গদর পার্টি ৭
গর্ডন ৭০
গয়ার কংগ্রেস ৮
গান্ধী (মহাত্মা) ৮, ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪২, ৭৫, ৭৭, ৯১, ৯৬, ৯৭, ১১৩, ১২৯, ১৩৬, ১৬৫

গাড়োয়ালী সেনার বিদ্রোহ ৩৬
গাংপুর রাজ্যে আন্দোলন ৯৮
গুরুমুখ সিং ৮৭
গুরুদিৎ সিং (বাবা) ৬৯
গুলজারা সিং ৮৮
গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে ৫
গোপীনাথ বড়দলৈ ৪৭
গোপীনাথ সাহা ৭৫
গোলটেবিল বৈঠক ৯, ১০, ৩৬, ৩৭
গোপুরে আন্দোলন ৪৩
গোয়ালপাড়ায় আন্দোলন ৪৫
গৌরচন্দ্র বিষয়ী ৪৩
গ্রাসবি ৮২

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ৯, ৭৮
চন্দ্রকুমার চক্রবর্তী ৭২
চম্পক রমণ পিলে ৭২
চার্চিল ৩৯
চারু বসু ৬৭
চার্লস টেগার্ট ৭৪, ৭৫, ৮৪
চাঁদপুরে ধর্মঘট ৩০
চিত্তরঞ্জন (দেশবন্ধু) ৮, ২৯, ৬৭, ১৩১
চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী ৭২, ৭৪
চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতা ২২
চিদাম্বরম্ পিলে ২৫
চিয়াং কাই সেক ১৬০, ১৬১
চিমুরে আইন অমান্য ৪৯
চুন্দ্রিগড় ১৫
চেরাগ আবলি শা ১৩৯
চৌরীচৌরা ৮, ৩২
চৌরঙ্গী রোড ৩৪
চৌকিদারী ট্যাক্স্ বন্ধ ৩৬

জওহরলাল ১২, ১৫, ২৯, ৩২, ৯৮, ৯৯, ১০৮, ১১৩, ১৩৩, ১৬৫
জগজীবনরাম ১৩
জগৎরাম ৬৯
জগদানন্দ মুখুজ্যে ৮৫
জন মাথাই ১২
জনসন (কর্ণেল) ২৮
জন এণ্ডারসন ৮৫
জন হকিন্স্ ১৪৬
জন ব্রাউন ১৫১
জনগনমন-অধিনায়ক ১১৭
জর্জ শ্লোকাম্ব ৩৫
জর্জ ওয়াশিংটন ১৪৭
জয়প্রকাশ ৪২
জয়পুরে আন্দোলন ৯৮
জাফর আলি ৭৫
জামিল খাঁ ৮৭
জাতীয় সঙ্গীত ১৪, ১১৬, ১১৭
জালিয়ানওয়ালা বাগ ৮, ২৭, ৮৫
জাহাজ : নাসিক, কলাবতী, আউধ, নিলাশ, হুগলি, আদিয়ার, চমক, হিমালয়, বাহাদুর, হিন্দুস্থান, কৃষ্ণা, কাবেরী, সাটলেজ, গোদাবরী ৯২, ৯৩
জিতেন দাসগুপ্ত ৮০
জীবনচন্দ্র বেরা ৪১

জুনাগরে আন্দোলন ৯৯
জুলিয়াস সিজার (অভিনয়) ১৫১
জোয়ান-দার্ক ১৩৬
জ্যাক্‌সন ৬, ২৬
জ্যোতিজ্জীবন ঘোষ ৮৩
জ্যোতিষ পাল ৭৪

টমাস (ক্যাপ্‌টেন) ১৪১
টাউনসেণ্ড ১৫৭
টিপু স্থলতান ১১২
টেগ্‌রা বল ৮০
টেরেন্স ম্যাক্‌স্থইনি ১৫৩
ট্রট্‌স্কি ১৫৩

ঠাকুর সাহেব ৯৭

ডগলাশ ৮৩ (মেজর) ১৪১
ডায়ার (জেনারেল) ৮, ২৮, ২৯, ৩০, ৮৫
ডি. এস. খাঁ ৮৮
ডে ৭৫
ডোকার (লেফ্‌টেন্যাণ্ট) ২৮
ডোভ্‌টোন (ক্যাপ্‌টেন) ২৮

ঢাকার হত্যাকাণ্ড ৮২
ঢেনকানলে আন্দোলন ৯৭

তলোয়ার ক্যাম্প ৯২
তারকনাথ দাস ৭, ৭২
তারকেশ্বর দস্তিদার ৮২
তারিণী মুখুজ্যে ৮২
তালচের-এ আন্দোলন ৪৩, ৯৭
তার্দিভিল ৬০
তে-ভাগা আন্দোলন ১০২
ত্রিপুরা সেন ৮০
তাঁতিয়া টোপি ১৪৪

থাকিন মু ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭
থানটুন ১৬৭
থিবি (জে) ৮৮

দামোদর চাপেকর ৫৫, ৫৬
দামাদ ফরিদ ১৫৭
দিল্লীতে বোমা ৭১
দীনবন্ধু সেন ২২
দীনবন্ধু এণ্ডরুজ ২৯
দীনেশ গুপ্ত ৮৪
দীনেশ মজুমদার ৮৫
দেবব্রত বসু ৬৭
দেবপ্রসাদ গুপ্ত ৮০
দেবনাথ দাস ৮৮
দেবব্রত বিশ্বাস ৯১
দেবী চৌধুরাণী ১৩৯

ধিকিয়াজুলিতে আন্দোলন ৪৪
ধীলন ৯০, ৯১

নগেন্দ্রনাথ সামন্ত ৪১
নরেন গোঁসাই ৬৪, ৬৫
নরেন ঘোষ ৭০

নরেন ভট্টাচার্য ৭০, ৭২, ৭৩
নরেন চৌধুরী ৭৩
নরেশ রায় ৮০
নন্দ বাঁড়ুজ্যে ৬৭
নন্দদুলাল সিংহ ৮৪
নবজীবন ঘোষ ৮৩
নলিনী দাস ৮৫
নরেন্দ্র-মণ্ডল ৯৬
নওগাঁ-এ আন্দোলন ৪৫
নববর্ষ উৎসব ২৭
নাগপুরী ৪৯
নানা পাতিল ৫০
নানা সাহেব ১৪৪
নাদিরশাহী হত্যাকাণ্ড ১৫
নিধন রাজবংশী ৪৭
নির্মলজীবন ঘোষ ৮৪
নির্মল লালা ৮০
নির্মল রায় ৭১
নিরঞ্জন সিং ৮৭
নিবেদিতা (ভগিনী) ৫৮
নিউ লাইট অফ বর্মা (পত্রিকা) ১৬৬
নিশান তোলার গান ১১৪
নীল ১৪৫
নীরেন দাসগুপ্ত ৭৪
নৃপেন ঘোষ ৭১
নৌবিদ্রোহ ১২, ৯২

পঞ্চম জর্জ (সম্রাট) ২৬
পত্রী ৫০
পলাশীর যুদ্ধ ১৩৯
পটনেকার ৮৭
পবিত্রমোহন প্রধান ৪৩
পল্লী ও গ্রামসমাজ ১৩০
পাকিস্তান ১৪, ১৬
পাটনায় আন্দোলন ৪২
পাঞ্জাবে আন্দোলন ৫১
পাইথু আর নার (পত্রিকা) ১৬৬
পি. সি. মিত্র ৫৭
পি. সি. দত্ত ৯২
পীতাম্বর থিল্লু ৪৩
পুলিনবিহারী দাস ২৬, ৬৯, ৭০
পুলিন ঘোষ ৮০
পুরীমাধব প্রামাণিক ৪১
পূর্ণচন্দ্র দাস ৭০
পূর্ব-এসিয়া তরুণসঙ্ঘ ১৬৬
পেডি ৯, ৮৩
প্যাথিক লরেন্স ১২
প্রজ্ঞানন্দ (স্বামী) ৭০
প্রমোদ চৌধুরী ৭৬
প্রভাস বল ৮০
প্রফুল্ল চাকী ৬০, ৬১, ৬৭
প্রদ্যোৎ কুমার ভট্টাচার্য ৮৪
প্রিংলি কেনেডি ২৫
প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দার ৮১, ৮২

ফণী নন্দী ৮০, ১৮
ফণী চক্রবর্তী ৭৩
ফণী বাঁড়ুজ্যে ২২
ফকির সেন ৮১
ফিয়ানাফেল ১৬৪

ফুলেশ্বরী ৪৪
ফেলি ১৪০
ফেলথাম ১৪১
ফ্যারেল ৭৮
ফ্যাসিবিরোধী লীগ ১৬৭

বরকতুল্লা ৭, ৬৮, ৭৫
বলদেব সিং (সর্দার) ১৩
বসোয়ার্থ স্মিথ ২৮
বসন্ত চাটুজ্যে ৭২
বঙ্কিম চৌধুরী ৭০
বঙ্কিম চাটুজ্যে ১১৭
বা-ম' ১৬৬
বটুকেশ্বর দত্ত ৭৬
বরোডিন ১৬০
বড়দৌলির আন্দোলন ৩১
বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলন ২২
বল্লভভাই প্যাটেল ১২, ১৬, ৯৪, ১০০
বালগঙ্গাধর তিলক (লোকমান্য) ৫, ৭, ২৩, ২৬, ৫৫, ৫৮
বলশেভিক দল ১৫৩
বাসন্তী দেবী ৩১
বাচ্ছিতর সিং (যশোবন্ত সিং) ৫১, ৫২
বারীন ঘোষ ৫৮, ৬৩, ৬৪, ৬৬, ৬৭
বহরমপুরে আন্দোলন ৪৫
বন্দেমাতরম ১১৬ (পত্রিকা) ২৪, ৫৮
(দল) ১৯
বাট্‌লার কমিটি ৯৬
বাহাদুর শা ১৪৩
বালকৃষ্ণ চাপেকার ৫৫, ৫৬
বার্জ ৮৪
বাজেলগেট ৯৭
বিবেকানন্দ ৫, ১২৮
বিপিনচন্দ্র পাল ৫, ৬, ২১, ২৫, ৫৮, ৫৯
বিপিন গাঙ্গুলি ৫৭, ৭০, ৭৩
বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ১৬
বিজয় রায় ৭০
বিনয় বসু ৮২
বিনয় রায় ৮৩
বিনায়ক দামোদর সাভারকর ৫৭
বিনোবা ভাবে ৪০
বিরাজ দেব ৮৩
বিমল দাসগুপ্ত ৮৩
বিষ্ণু পিংলে ৬৯, ৭২
বিধু ভট্টাচার্য ৮০
বিদ্যুৎ-বাহিনী ৪০
বিলাতে হত্যাকাণ্ড ৮৫
বীণা দাস ১০, ৮৪
বীরেন চাটুজ্যে ৭২
বীরেন সরকার ৭২
বীরেন দত্তগুপ্ত ৬৭
বীরাষ্টমী ২৪
বেচারাম লাহিড়ি ২২
বেটন ১৪০
বেংগলী (পত্রিকা) ৬৫
বেশাদ (সুলতান) ১৫৭
বোম্বাইয়ে প্লেগ ৫, ৫৫
বোম্বাইয়ে আন্দোলন ৩৪, ৫০
বোলপুরে আন্দোলন ৪১

বৌদ্ধ যুবসংঘ ১৬৫
ব্যামফিল্ড্ ফুলার ২১, ২২
ব্যাস্টিল ১৪৯
ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ৫, ২৪, ৫৮
ব্রহ্ম রক্ষীবাহিনী ১৬৬
ব্রজেন গাঙ্গুলি ২২
ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ২১
ব্রজকিশোর চক্রবর্তী ৮৪
ব্রতী সমিতি ১৯

ভগৎ সিং ৯, ১১, ৩৭, ৭৬, ৭৭,
ভবরঞ্জন মজুমদার ২৬
ভবানী পাঠক ১৩৯
ভবানী ভট্টাচার্য ৮৫
ভল্টেয়ার ১৪৮
ভাই পরমানন্দ ৬৯
ভাবা (সি. এইচ.) ১৩
ভিক্টোরিয়া (মহারাণী) ৫৬, ১৪৫
ভিক্ষু উত্তম ১৬৫
ভূপেন বসু ২৩
ভূপেন দত্ত ২৪, ৫৮, ৬৭, ৭২
ভূপেশ নাগ ২৬
ভূপতি মজুমদার ৭৩
ভূপেন চাটুজ্যে (রায় বাহাদুর) ৭৬
ভেলু থাম্পি ৯৬
ভোলানাথ চাটুজ্যে ৭৩
ভোগেশ্বরী ৪৬
ভোঁসলা (জে. কে.) ৮৮

মতিলাল নেহেরু ৮, ২৯, ৩২
মতি কানুনগো ৮০
মদনমোহন মালব্য ৯, ২৯, ৩৭
মদনলাল ধিংড়া ৬, ৫৬
মণ্টেগু ৭
মণি দত্ত ৮২
মহম্মদ ইকবাল ১৪
মহম্মদ আলি ৭৫ (মৌলানা) ১৩
মহম্মদ আলি জিন্না ১৪, ১৫, ১৬
মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা ২৬, ৫৮
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ৮৩
মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ৭৪, ৮০
মনোমোহন ঘোষ ৭০
মধু দত্ত ৮০
মরিস গয়ার (স্যার) ৯৭
মরিসন ১৪১
মজনু শাহ ১৩৯
মঙ্গল পাঁড়ে ১৪৩
মজঃফরপুরে বোমা ২৫
মণ্টেগু চেমস্ফোর্ড সংস্কার ৯৬
মহাস্থানগড় দুর্গ ১৪১
মাতঙ্গিনী হাজরা ৪১
মাখন ঘোষাল ৮১
মার্টিন (সি) ৭৩
মামুদ হাসান ৭৫
মাদার বক্স ১৩৯
মাণিকতলায় বোমা ৬, ২৫, ৬৪
মালকানগুড়িতে আন্দোলন ৪২
মাইকেল কলিন্স ১৬৩
মার্টল ১৪১
মাও সে তুং ১৬১

মণ্টো (লর্ড) ২৫, ৬৬
মণ্টো-মর্লি সংস্কার ৬
মিওচিং দল ১৬
মীরকাসিম ১৩৯
মুঞ্জে (ডাক্তার) ২৩

মুকুন্দ কাবুতি ৪৪
মুক্তি সংঘ ১৫৫
মুছা শা ১৩৯
মুসলীম লীগ ১০, ১১, ১৩, ১৫, ১৬
মৃগেন্দ্র কুমার দত্ত ৮৪
মৃত্যু-বাহিনী ৪৬
মেদিনীপুরে হত্যাকাণ্ড ৯, ৮৩
মেনন (কে. পি. এস) ১৬
ম্যাকডোন্যাল্ড ৩৭
মক্কার সেরিফ ৭৫
মন্ত্রীদের তালিকা ১১৮

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (দেশপ্রিয়) ৩১, ১৬৫
যতীন রায় ৫৭, ৫৯, ৭০
যতীন বাঁড়ুয্যে ৫৭
যতীন মুখুয্যে ৭, ৭০, ৭২, ৭৩, ৭৪
যতীন দাস ৯, ৭৭
যদুগোপাল মুখুয্যে ৭০, ৭৩, ৭৪
যশোবন্ত সিং সিদ্ধা ৮৭
যমুনালাল বাজাজ ৯৮
যশোদা ১৫
যীশু ১৩৬

যোগেন দে সরকার ৭০
যোগেন্দ্র শুক্ল ৪২
যোগেশ চাটুয্যে ৭৫, ৭৬
যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ৫০
য়ুয়ান শি কাই ১৬০

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৬, ১৭, ২৩, ২৯, ১১৭, ১২৯
রবীন ব্যানার্জী ১০
রণধীর গুপ্ত ৮১
রণপুরে আন্দোলন ৯৭
রজত সেন ৮০
রশিদ আলি ৯১
রজনীকান্ত সেন ১৮
রজনী দাস ২২
রডা কোম্পানি ৭০
রত্নমালা ৪৫
রাসবিহারী বসু ৭, ৬৯, ৭১, ৭২, ৭৪, ৮৮
রাসবিহারী ঘোষ ৬
রাজগুরু ৯, ৩৭, ৭৭
রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ ৭, ৭৫
রাজেন্দ্রপ্রসাদ ১২, ১২২, ১৬৭
রাজেন লাহিড়ি ৭৬
রাজকুমার ৭০
রাজা রুদ্রনারায়ণ ১৪১
রাজকার দল ১০০
রাজকোটে আন্দোলন ৯৭

রাজাগোপালাচারী ১২
রামচন্দ্র বেরা ৪১
রামনন্দন মিশ্র ৪২
রামচন্দ্র পেশোয়ারী ৬৮
রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ৮২
রামপ্রসাদ বিসমিল ৭৬
রামকৃষ্ণ রায় ৮৪
রামেশ্বর বাঁড়ুয্যে ৯১
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ৬, ১৮
রামস্বামী আয়ার ৯৬
রামটেকে আন্দোলন ৪৯
রাশব্রুক ৯৬
রাসপুটিন ১৫৩
রাউলাট আইন ৮, ২৭
রাখীবন্ধন উৎসব ১৮
রিজ্‌লি সার্কুলার ১৯
রুশো ১৪৮
রুজভেল্ট ৩৯
রেজিন্যাল্ড ডরমেন স্মিথ ১৬৬
রেশমী-রুমাল ষড়যন্ত্র ৭৫
রোশন সিং ৭৬
র‍্যাণ্ড ৫, ৫৬

লক্ষ্মীনারায়ণ দাস ৪১
লক্ষ্মীরাম হাজারিকা ৪৬
লক্ষ্মী স্বামীনাথম্‌ ৮৮
লক্ষ্মণ নায়ক ৪২
লক্ষ্মীবাঈ (রাণী) ১৪৪
লয়েড গ্যাবিসন ১৫০
লালমোহন সেন ১৫, ৮১
লালা হরদয়াল ৭, ৭২
লালপদম বাহাদুর ৪৮
লালা লাজপত রায় ৫, ২৫, ৩২, ৫৮
লালা উধমচাঁদ ৮৭
লাসিম ১৫
লাহোর ষড়যন্ত্র ১৪, ৩৬
লায়ন সার্কুলার ১৯
লাটসাহেবদের নাম ১১৮
লিসেস্টার ১৪০
লিয়াকত আলি ১৫
লিবারেটর (পত্রিকা) ১৫০
লীগ অফ ইয়ং ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল্‌স্‌ ১৩২
লুই মাউন্টব্যাটেন (লর্ড) ১৬, ১৬৭
লেনিন ১৫৩
লোম্যান ৯, ৮২
লোকনাথ বল ৮১
লোকনাথন (এ. পি.) ৮৮

শচীন মিত্র ১৫
শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু ২৬
শচীন সান্ন্যাল ৭২, ৭৫, ৭৬
শরৎচন্দ্র বসু ১২, ১৫
শশধর আচার্য ৮১
শশাঙ্ক সেন ৮০
শহীদগঞ্জ গুরুদ্বার ১৪
শওকৎ আলি ৭৫
শাদা কাগজ (আইন) ১০
শান্তি ঘোষ ১০, ৮৩
শান্তি চক্রবর্তী ৮২
শান্তিগোপাল সেন ৮৪

শা-নওয়াজ ৮৮, ৯০, ৯১
শাসনতন্ত্র ১২৪
শিবাজী ২৩, ৫৫, ১১২
শুকদেব ৯, ১৪, ৩৭, ৭৭
শেখ আবদুল্লা ৯৮
শৈলেন বসু ৬৭
শ্যামলদাস গান্ধী ১৬, ১০০
শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ২৬, ৫৮
শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা ৫৬
শ্রদ্ধানন্দ (স্বামী) ১৩, ২৯
শ্রমজীবী সমবায় ৭৪
শ্রীরাম রাজু ৭৭, ৭৮

সরলা দেবী ২৪
সতীশ চাটুয্যে ২৬
সতীশ মুখুয্যে ৫৭
সতীশ চক্রবর্তী ৬১, ৭০, ৭৩
সত্যেন সেন ৭২
সর্বেশ্বর ডালু ১৫
সবরমতী আশ্রম ৩৩
সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ১৩, ১৩৯
সন্ন্যাসী-কোট দুর্গ ১৪১
সনাতন রায় ৮৪
সরোজিনী নাইডু ৯, ৩৫, ৩৭
সরোজ গুহ ৮১
সত্যেন বসু ৬৪, ৬৫, ৬৬
সহায়রাম দাস ৮১
সক্রেটিস ১৩৬
সমীরুদ্দিন ১৫
সহ্যাদ্রিতে আন্দোলন ৪৯
সন্ধ্যা (পত্রিকা) ২৪
সন্তান সম্প্রদায় ১৯
সত্যপাল (ডাক্তার) ২৭
সানডার্স ৯, ৩৭
সাফাৎ আমেদ খাঁ ১৩, ১৫
সামশুল হক ৬৭
সান ইয়াৎ সেন ১৫৯, ১৬০
সাবিত্রী দেবী ৮১
সামন্ত রাজাদের খরচ ৯৯
সিপাহী বিদ্রোহ ৩, ১৩, ১৩৯
সিমসন ৯
সিনফিন ১৬২
সিন্ধুতে আন্দোলন ৫১
সীমান্তে আন্দোলন ৫২
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫, ৬, ১৮, ২২, ২৩, ৬৫
সুনীতি চৌধুরী ১০, ৮৩
সুভাষচন্দ্র বসু ১০, ১১, ১২, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৯০, ১৩২, ১৬৫
সুখেন্দুবিকাশ ১৫
সুবোধচন্দ্র বসু মল্লিক ২১
সুশীল সেন ২৫
সুনীতি দেবী ৩১
সুহাসিনী গাঙ্গুলী ৮১
সুবোধ রায় ৮১
সুখেন্দু দস্তিদার ৮১
সুরেন কর ৮৩
সুরেন ঘোষ ৭০
সুরেশ মুখুয্যে ৭২
সুবোধ চৌধুরী ৮০

সুকুমার সেন ৮৪
সুব্রাহ্মণ্য আয়ার ২৫
সূর্যকান্ত আচার্য ২১
সূর্য সেন ৭৮, ৭৯, ৮১, ৮২
সুহৃদ্ সমিতি ১৯
সেহগল ৯০, ৯১
সোহন সিং ভাখ্না ৬৮
সোহনলাল ৫২
সৈয়দ আমেদ ১৩
সৌরাষ্ট্রে কংগ্রেস ৬
স্টাফোর্ড ক্রিপ্স্ ১০, ১২
স্টিভান্স ১০, ৮৩
স্টেপ্লটন ২০
স্টেট্স জেনারেল ১৪৮
স্টেট্সম্যান (পত্রিকা) ৮৪
স্ট্যান্লি জ্যাক্সন ১০, ৮৪
স্বদেশবান্ধব সমিতি ১৯, ৫৭
স্বদেশমণ্ডলী ১৯
স্বদেশ রায় ৮০
স্বরূপরাণী নেহরু ৩৬
স্বরাজ্য দল ৮
স্ট্যালিন ১৪৯
স্মরণীয় দিন ১৩৪
হরদয়াল নাগ ৩২
হরবংশলাল ৫২
হরিপদ ভট্টাচার্য ৮২
হরিকুমার চক্রবর্তী ৭৪
হরিদাস মিত্র ৯১
হরিশচন্দ্র (রাজা) ১৫০
হরেন চক্রবর্তী ৮২
হাডসন ৮২, ১৪৪, ১৪৫
হাকিম আজমল খাঁ ১৩
হাসতান ৮৭
হাণ্টার কমিটি ২৯
হার্ডিঞ্জ (লর্ড) ৭, ৭১
হাউস অফ লর্ডস ৩০
হায়দরাবাদে আন্দোলন ৯৮
হিমু কলানী ৫১
হিটলার ৮৭
হিন্দুধর্মের বিঘ্ন অপসারণ সমিতি ৫৫
হীরালাল চক্রবর্তী ৮৩
হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল ৬৭
হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য ৫৭, ৭০
হেমচন্দ্র কানুনগো ৫৮, ৬৩, ৬৭
হেমন্তলাল গুপ্ত ৭২
হেগেন বোথাম ৬০
হেরম্ব গুপ্ত ৭৩
হেনরি লরেন্স ১৪৩
হোম-রুল ৭
হোয়াইট্ ১৪০
হ্যাব্লক ১৪৩
হ্যারি এণ্ড সন্স ৭৪

যে সব বই থেকে সাহায্যনিয়েছি ঃ

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখিত—'কংগ্রেস'
বিপিনচন্দ্র পাল লিখিত—'মেমারিজ অফ মাই লাইফ এণ্ড টাইমস্'
মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী লিখিত—'মাই একস্‌পেরিমেণ্টস্ উইথ ট্রুথ'
হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত লিখিত—'দেশবন্ধু স্মৃতি'
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার লিখিত—'বিবেকানন্দ চরিত'
দীনেন্দ্রকুমার রায় লিখিত—'অরবিন্দ প্রসঙ্গ'
যোগেশচন্দ্র বাগল লিখিত—'মুক্তির সন্ধানে ভারত'
জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার লিখিত—'বংশ পরিচয়'
বসুমতী সাহিত্য-মন্দির প্রকাশিত—'লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক'
হেমচন্দ্র বক্‌সী লিখিত—'লালা লাজপৎ রায়'
সুরেন্দ্রনাথ ধর লিখিত—'দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন'
বিশ্বেশ্বর দাস লিখিত—'রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র'
আর. পি. মাসানী লিখিত—'দাদাভাই নওরোজী'
কেশবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত—'উমেশচন্দ্রের জীবনী'
রেজাউল করিম লিখিত—'মনীষী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ'
পট্টভি সীতারামিয়া লিখিত—'দি হিস্ট্রি অফ কংগ্রেস'
অতুল মজুমদার লিখিত—'চরিতমালা'
মাদ্রাজ পাব্‌লিকেশন প্রকাশিত—'ইণ্ডিয়ান নেশন বিলডার্স'
আর চৌধুরী সম্পাদিত—'প্লাউ বয় টু প্রেসিডেণ্ট'
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত—'এ নেশন ইন মেকিং'
ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখিত—'রিপ্রেজেনটেটিভ ইণ্ডিয়ান্‌স্'
ধীরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার লিখিত—'ভারতের স্বরাজ সাধক'

সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত—'দি ফাদার অফ মডার্ণ ইণ্ডিয়া'
ভাই পরমানন্দ লিখিত—'ষ্টোরি অফ মাই লাইফ'
জগদানন্দ বাজপেয়ী লিখিত—'সাভারকর'
নগেন্দ্রকুমার গুহরায় লিখিত—'শহীদ যুগল'
সুধীরকুমার সেন লিখিত—'মরণজয়ী বীর'
সুধীরকুমার মিত্র লিখিত—'মহাবিপ্লবী রাসবিহারী'
চারুবিকাশ দত্ত লিখিত—'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন'
নিরঞ্জন সেনগুপ্ত প্রকাশিত—'শচীন্দ্রনাথ'
বারীন্দ্রকুমার ঘোষ লিখিত—'দ্বীপান্তরের কথা'
হেমচন্দ্র কানুনগো লিখিত—'বাঙ্গলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা'
মতিলাল রায় লিখিত—'স্বদেশী যুগের স্মৃতি'
ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত—'অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস'
প্রমোদ সেনগুপ্ত লিখিত—'ভারতীয় মহাবিদ্রোহ' (১৮৫৭)
নলিনী কিশোর গুহ লিখিত—'বিপ্লবের পথে'
যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখিত—'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি'
আনন্দপ্রসাদ গুপ্ত লিখিত—'চট্টগ্রাম বিদ্রোহের কাহিনী'
দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত—'বিদ্রোহে বাঙ্গালী'
শচীন্দ্রনাথ সান্যাল লিখিত—'বন্দী জীবন' (২ খণ্ড)
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত—'নির্বাসিতের আত্মকথা' ও 'সিনফিন'
অরবিন্দ ঘোষ লিখিত—'কারা কাহিনী'
তারানাথ রায় লিখিত—'কামাল পাশা ও নব্যতুর্কী'
অরুণচন্দ্র গুহ লিখিত—'চীনের যুবজাগরণ'
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় লিখিত—'ডি ভ্যালেরা'
প্রবোধচন্দ্র সিংহ লিখিত—'উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব'

মাসিক পত্রিকা ঃ	মডার্ন রিভিউ
	প্রবাসী
	বসুমতী
দৈনিক পত্রিকা ঃ	আনন্দবাজার
	যুগান্তর
	ভারত
	অমৃতবাজার

বই সংগ্রহ করে দিয়ে সাহায্য করেছেন ঃ
সুরতিবাগানের 'সুহৃদ লাইব্রেরী'
ঝামাপুকুরের 'কানাই স্মৃতি পাঠাগার'

॥ শ্রীধীরেন্দ্রলাল রচিত পুস্তকাবলী ॥

● ভ্রমণ কথা

মন্দিরে মন্দিরে	৬'০০
পশ্চিম দিগন্তে	৫'০০
নালন্দা থেকে লুম্বিনী	৩'৫০
কাশ্মীর	২'০০

● জীবনী

আমাদের গান্ধিজী	১২'০০
আমাদের রবীন্দ্রনাথ	৮'০০
আমাদের সুভাষচন্দ্র	৫'০০
আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র	৪'০০
প্রিয়দর্শী অশোক	১'০০
গল্প হলেও সত্যি	২'৫০
এই দেশেরই মেয়ে	২'৫০
বন্দী-জীবন	২'০০
আমার দেশের মানুষ	০'৭৫

● উপন্যাস

ঢেউ	২'৫০
বড় সাহেব	২'০০
রতি বিলাপ	২'০০
আলোর ইশারা	৪'০০
মহাকালের পূজারী	২'০০

● ছোটদের বই

আখ্যান-মালিকা	১'৫০
ছুটির ঘণ্টা	২'৫০
মনের মত বই	২'২৫
রঙীন আকাশ	২'০০
নাচ গান ছড়া	১'১২
যুদ্ধের গল্প	৩'০০